আঁধারে স্বপ্ন খোঁজা



সিন্টু বাগুই

আয়েশা (আয়ুশ গুপ্তা)

আঁধারে স্বপ্ন খোঁজা

সিন্টু বাগুই
আয়েশা (আয়ুশ গুপ্তা)

সম্পাদনায়

ঋ

প্রকাশনায়

দাক্ষায়ণী প্রকাশনী

First published 2025
by Daxayoni Prokashoni
Kolkata, West Bengal, India

First issued in paperback 2025

© 2025, Sintu Bagui and Ayesha (Ayush Gupta); editorial matter, Wree

All rights reserved. No Part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the authors.

A digital version of this book is available in the Internet Archive; at https://archive.org

Cover, typeset, & layout design by Wree
Printing assistance by Susovan Pramanik

Daxayoni Prokashoni is a publishing imprint by Wree

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

দাক্ষায়নী প্রকাশনী শুরু করার সময় আমার কাছেও ঠিক খোলসা ছিল না যে আমি ঠিক কী করতে চাই। আমি নিজের কাজ নিজেই বের করব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু তার সাথে সাথে আমার মত অন্য যারা ভালবেসে কোন কাজ করছে সেটা প্রকাশ করার সিদ্ধান্তও আমি নিয়েছিলাম। তখন এই কাজটায় কতটা সময় বা শ্রম দিতে হবে তা নিয়ে আমার কোন ধারণাও ছিল না। বুঝতেও পারিনি এই কাজগুলোর সাথে কতটা জড়িত থাকতে হবে।

আয়েশা ও সিন্টুর সাথে আমার বেশ কয়েক বছরের পরিচয়। আমি ওদের ইভেন্টে গেছি, ওদের ওয়ার্কশপ নিয়ে ফোটো তোলা বা লেখালেখিও করেছি। আর কিছু ডিজাইন এবং ওয়েবসাইটও বানিয়েছি। আয়েশার সাথে গত বছর "রূপান্তরকামী মানুষদের নাট্যশালা: একটি চিত্রকথাময় পুস্তিকা" শীর্ষক বইটি প্রকাশও করেছি।

২০২৪ এর নভেম্বরে সিন্টু আর আয়েশা যখন মালদা আর শিলিগুড়ি গেল বইয়ের কাজে, তখন ওদের সাথে আমিও জুটে গেছিলাম। বইটির সাথে সেই তখন থেকেই যুক্ত আছি।

সিন্টু বিশ্লেষণটা অডিও রেকর্ড করে পাঠাত। আমি সেটা বাংলা টাইপ করে নিতাম, আর আয়েশা ইংরাজি অনুবাদ করত। তারপর আমরা তিনজন বসে এডিট করতাম। গল্পগুলো লিখে আমরা 'এক নজরে' অধ্যায়টা নিয়ে বসলাম। আমরা একটা একটা কাগজে আমাদের বিভিন্ন আইডিয়া গুলো এঁকে নিলাম, তারপর একে অপরের সাথে আলোচনা করে ঠিক করতাম কোন আইডিয়া টা আমাদের তথ্যটাকে সঠিক ভাবে বর্ণনা করছে। অংশগ্রহণকারীরা নিজের যে আত্মপরিচয় দিয়েছে, সেটাকে সঠিক ভাবে বর্ণনা করা নিয়েও আমাদের মধ্যে প্রচুর পর্যালোচনা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমাদের চোখে আমাদেরই কিছু ত্রুটি ধরা পড়েছে।

এই বইটি নিয়ে আমি খুবই গর্বিত। তথাকথিত শিক্ষাজগতের বাইরে থাকা সত্ত্বেও সিন্টু নিজের ভাষায় নিজের গবেষণাকে এই বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। তাই পাঠকদেরকে আমি বইয়ের গল্প গুলিকে সিন্টুর নজর থেকে দেখতে চেষ্টা করতে অনুরোধ করব।

সিন্টু, আয়েশা, ও আমার মধ্যে বইটা কোথায়, কীভাবে প্রকাশ করা হবে, সেটা নিয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে। যেহেতু এটি গবেষণাভিত্তিক প্রবন্ধমূলক রচনা, বইটির ডিজিটাল সংস্করণ তাই আমরা আর্কাইভ ডট ওআরজি ওয়েবসাইটে বিনামূল্যে বিতরনের জন্য রেখেছি। এটা আমার এবং দাক্ষায়ণী প্রকাশনীর একটি নীতি। বইটির মুদ্রিত সংস্করণ আমরা বিক্রি করছি।

বই বিক্রির মোট লাভের চল্লিশ শতাংশ পাবে সিন্টু। ত্রিশ শতাংশ পাবে সেই পনেরজন, যাদের গল্প আমরা এখানে প্রকাশ করেছি। বাকি ত্রিশ শতাংশ পাবে দাক্ষায়ণী প্রকাশনী। সেই সব কথা মাথায় রেখে আমরা বইটির দাম ধার্য করেছি দুইহাজার টাকা। এই দামটা বইয়ের দাম নয়। এই টাকাটা যাবে প্রান্তিক স্তরের রূপান্তরকামী মানুষের হাতে। যা আমারা অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বলে মনে করি। তার সাথে সাথে এই টাকাটা দাক্ষায়ণী প্রকাশনীর পরিকাঠামো গঠনের পেছনে যাবে, যাতে আমরা ভবিষ্যতে এই কাজগুলো স্বাধীন ভাবে করে যেতে পারি।

আশা রাখি গল্পগুলি পাঠকদের জন্য লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আর শ্রমিক আন্দোলনের স্বপক্ষে হয়ে চলা আন্দোলনের কয়েকটি উদাহরণ হয়ে উঠুক। আশা রাখি গল্পগুলি পাঠকরা উপভোগ করুক। আর আশা রাখি ভবিষ্যতে এরকম বই পড়ার সৌভাগ্য যেন আরো অনেক হয়।

অকপটে,
ঋ

ডিসেম্বর, ২০২৪

ভূমিকা ১

সোমা রায়

সিন্টু কে আমি ২০১৩ সাল থেকে চিনি এবং ওর জীবন সংগ্রাম আমাকে গভীর অনুপ্রেরণা দেয়। সেই জন্য সিন্টুর বইতে এই ভূমিকাটি লিখতে পেরে আমি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করছি। সিন্টুর একজন নব্য কমিউনিটি লিডার থেকে আস্তে আস্তে বড় নেত্রী হয়ে ওঠার এবং তার সাথে সাথে রূপান্তরকামী মানুষদের জীবন, স্ট্রাগল, ও অদম্য জেদের গল্প দেশে বিদেশে পৌঁছে দেওয়ার আমি একজন অন্যতম সাক্ষী।

আমার নিজস্ব জীবন ও কর্ম ক্ষেত্রে সিন্টুর সাথে যোগাযোগ খুবই অর্থবহ। আমাদের একসাথে চলার পথের এক অন্যতম ফলক ওর জীবন নিয়ে নির্মিত একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম। এই সিনেমায় সিন্টু ছাড়াও কমিউনিটির আরো বিভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষের উপর হয়ে চলা নিপীড়ন, তাদের অদম্য সাহস, ও সহ্য শক্তির নিদর্শন দেখানো হয়। সিনেমার মোড়কের বাইরে বেরিয়ে এসে এটি সংলাপ, সচেতনতা, আর পরিবর্তনের এক হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

২০১৮ সালে আমেরিকার সতেরটি বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে আমরা সিনেমাটার স্ক্রিনিং করাই। প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটা ক্লাসরুমে, হলে, অডিটোরিয়ামে সিন্টু, বঞ্চিত-অবহেলিত মানুষদের চাহিদা এবং আশা আকাঙ্ক্ষা, এক অবিশ্বাস্য সততা, মর্যাদা, ও শক্তির সাথে জ্ঞাপন করে। সিন্টুর এই জটিল বাস্তবকে সৎ ও সহজ ভাষায় পরিবেশন করার ক্ষমতাটা উপস্থিত ছাত্র, অধ্যাপক, গবেষক, ও সংগঠকদের মনে খুবই নাড়া দেয়। এই বার্তালাপগুলি থেকে আরো নতুন রিসার্চ কোলাবোরেশন উঠে আসে, শিক্ষাজগতের আগ্রহ আরো বাড়ে, এবং লিঙ্গবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ব্যাপারে বুঝতে গোটা বিশ্বের মানুষকেই খানিকটা সাহায্য করে।

ভারতে ফিরে আসার পরে সিনেমাটি নিজের যাত্রা জারি রাখে। ভারতের উনিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সিনেমাটি স্ক্রিনিং হয়। সিন্টুর উপস্থিতি এবং ওর করা বার্তালাপ সেশনগুলি বহু তরুণ বিদ্বান, গবেষক গোষ্ঠী, ও সুশীল সমাজের সদস্যদের জন্য রূপান্তর মূলক হয়ে উঠত। শিক্ষাগত পরিসরের বাইরে সিন্টুর গল্প বিভিন্ন বিচার বিভাগীয় সংস্থা, পুলিশ কর্মকর্তা, এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার দরজা খুলে দিয়েছে। তাদেরকে বিভিন্ন ভুল ধারণা ও প্রক্রিয়ার বাইরে বেরিয়ে এসে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে নতুন করে ভাবাতে পেরেছে।

২০১৯ সালে সিন্টু সাংগঠনিক ক্ষমতা ও অভ্যন্তরীণ বৈষম্যের শিকার হয়। এখানে এটাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বৈষম্য যে কোন স্থানে জন্ম নিতে পারে, তা সে বৈষম্য বিরোধী জায়গাই হোক না কেন। এতেও সিন্টু কিছু হটেনি, বরং এই অভিজ্ঞতাকে অঙ্গীকারে পরিবর্তন করে সততা, ক্ষমতা, ও স্পষ্টতা নিয়ে নতুন করে আবার নিজের কাজ চালিয়ে নিয়ে গেছে। কমিউনিটির কথা মাথায় রেখে সিন্টুর এই সমস্ত সমস্যার বিরুদ্ধে সফলভাবে রুখে দাঁড়ানোতেই সিন্টুর চরিত্র ও ন্যায়বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সিন্টুর

নেতৃত্ব শুধু জনসংযোগী প্রচারেই থেমে নেই, কলকাতা আনন্দম ফর ইকোয়ালিটি অ্যান্ড জাস্টিস সংগঠনের সিন্টু একজন সহ-সংগঠক। এই সংগঠনটি এলজিবিটিকিউকেএইচ (লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্স, কুইয়ার, কোতি, হিজড়া) মানুষজনের মর্যাদা, সুরক্ষা, ও সমতাপ্রাপ্তির লক্ষ্যে তৈরি।

জীবনের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা জগত, নীতি নির্ধারক, তৃণমূলী বাস্তব, এবং সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রতি সিন্টুর অঙ্গীকারের প্রতিফলনটা ক্যাফে মেলা, বিভিন্ন কমিউনিটি সমাবেশ বা বিভিন্ন গবেষণায় সিন্টুর অংশগ্রহণে দেখা যায়। যে যে পরিসরে সিন্টু প্রবেশ করে, সেখানে সে স্বকীয়তা, স্বচ্ছতা, ও সততা নিয়ে আসে, যা মানুষকে শুনতে, ভাবতে, ও কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। সিন্টুর বিষয়ে সবচেয়ে প্রথমে যেটা চোখে পড়ে সেটা, সে কতটা সাহসের সাথে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় শুধু তা নয় বরং কতটা উদারতার সাথে নিজের অভিজ্ঞতা কে শিক্ষা হিসাবে অন্যদের দেখাতে পারে। সিন্টু তার কমিউনিটির গল্পগুলিকে দায়িত্ব আর মর্যাদার সাথে বহন করে। সিন্টু আমাদের সকলকে মনে করিয়ে দেয় যে পরিবর্তন শুধু সংগ্রাম থেকে নয়, বরং কথা বলার, দৃশ্যমান হওয়ার, এবং আশাবাদী থাকার ইচ্ছা থেকেও জন্ম নেয়।

সিন্টুর সাথে পরিচয় এর এই বারো বছর নিয়ে আমি যখন ভাবতে বসি তখন সিন্টুর জীবনযাত্রা দেখে আমি অনুপ্রাণিত হই এবং তার কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে তার পাশে থাকার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞবোধ করি। সিন্টুর নেতৃত্ব শান্ত অথচ শক্তিশালী। সিন্টুর অবিচল সহ্যশক্তি এবং সিন্টুর অবদান দেশ-বিদেশের বহু ব্যক্তির ও সংগঠনের মনে গভীর ছাপ ফেলেছে।

গভীর শ্রদ্ধা ও গর্বের সাথে আমি সিন্টুর ভূমিকাটি উপস্থাপন করছি, যার জীবন ও কর্ম আজও মর্যাদা, ন্যায়-বিচার, ও সাম্যের পথে আলো দেখায়

শুভেচ্ছান্তে,
ডা. সোমা রায়

উপদেষ্টা ও শুভাকাঙ্ক্ষী
কলকাতা আনন্দম ফর ইকুয়ালিটি অ্যান্ড জাস্টিস

ভূমিকা ২

সায়ন ভট্টাচার্য

সিন্টু বাগুই আর আয়েশার লেখা এই বইটিতে অবদান রাখতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি সিন্টুকে প্রায় এক দশক ধরে চিনি এবং ওর জীবনের বহু পর্যায়ে আমি ওকে দেখেছি। সেই যৌনকর্মীদের সংগঠনে স্বল্প বেতনে চাকরি করার সময় থেকে, পশ্চিমবঙ্গের রূপান্তরকামী ও কুইয়ার মানুষদের গল্পগুলিকে আমেরিকার নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলে ধরা থেকে, এলজিবিটি নেতৃত্বাধীন সংসদ গঠন করা থেকে, কোতি ও ট্রান্স মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ফুড পপ-আপের আয়োজন করে তাদের উপার্জনের সংস্থান করে দেওয়া থেকে সবশেষে কলকাতা আনন্দমের সহ-প্রতিষ্ঠাতা হয়ে ওঠা অব্দি।

এত আর্থিক অনিশ্চয়তা আর ক্লান্তিকর অ্যাক্টিভিস্টি কর্মকাণ্ডের সব মুহূর্তের মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে রূপান্তরকামী মানুষদের জন্য আরো উন্নত জীবন গঠনের প্রতি সিন্টুর এক দৃঢ় সংকল্প, যেটি শ্রমের মর্যাদা, জেন্ডার এক্সপ্রেশনের অধিকার, ও সার্বিক স্বাস্থ্যের ওপর ভিত্তি করে একটি ন্যায্য ট্রান্স ভবিষ্যতের জন্য সম্মিলিত রাজনৈতিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত। তাই যখন আমার বন্ধু সিন্টু জানালো যে ও রূপান্তরকামী মানুষদের ক্ষমতায়নের কল্পনা নিয়ে একটি গবেষণামূলক বই লিখছেন এবং সেটির সহ-লেখক সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ আয়েশা, যার তৃণমূলী উদ্যোগ গুলির সাথে ট্রান্স মুভমেন্ট বিল্ডিং এর উপর কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, তখন আমি অবাক হইনি।

এই বইটি খুবই যত্ন সহকারে লেখা। এখানে আপনি বিভিন্ন জাতি, আয়, ও বয়সের রূপান্তরকামী মানুষদের জীবন কাহিনী খুঁজে পাবেন। তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার বলে, কিন্তু অনেকেই বলে না। স্বাভিব্যাক্তির জন্য কেবল ইচ্ছে থাকলেই হয় না, তাদের কাছে সাংস্কৃতির পুঁজিও উপলব্ধ থাকতে হয়। কিন্তু তারা নিজেদের যেভাবেই পরিচয় দিক না কেন, তাদের নিজেদের লিঙ্গের সত্ত্বা সম্পর্কে তাদের গভীর উপলব্ধি আছে, এবং এটি তাদের ভালো থাকার ধারণাকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা সম্পর্কেও তারা অবগত। তারা অনেকে পরিচারিকার কাজ করেন, অনেকে যৌন পেশায় আছেন, সেলসের কাজে আছেন, হিজড়া পেশায় যুক্ত কিছুজন, নানা আঞ্চলিক শিল্পকলার সাথে যুক্ত আছেন কিছুজন, বা কোন ছোট কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কর্মরত। এখানে এটাই বলতে চাইছি যে, এদের সবারই কোনো না কোনো অসংগঠিত ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থান হয়। যেখানে কোন নিয়ম-কানুন নেই, এবং শ্রমিকদের সুরক্ষার কোন অধিকারও নেই। এই কাজের অনিশ্চয়তাটা অসংগঠিত ক্ষেত্রের সব কর্মজীবী মানুষদের জীবনেই আছে, কিন্তু লিঙ্গ পরিচয়গত বিদ্বেষের জন্য এই কাজের জায়গাটা রূপান্তরকামী মানুষদের জন্য আরও অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

তাই ট্রান্স ক্ষমতায়নের কল্পনায় আমাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং হয়রানি মুক্ত এক নিরাপদ কাজের পরিবেশ ইত্যাদি যোগ করতে হবে। তবে ক্ষমতায়ন মানে শুধু কর্মসংস্থানের অধিকার নয়, নিজের লিঙ্গপ্রকাশের অধিকার এবং তা করার জন্য

প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, নিজের বেছে নেওয়া পরিবার ও বন্ধুদের ভালবাসা ও সমর্থন, জন্মগত পরিবারের সম্মান ও ভালোবাসা পাওয়া, ও এরকম আরো অনেক কিছুই।

বইটি শেষের দিকে গবেষণার কিছু বিশ্লেষণ আছে এবং কয়েকটা নীতির সুপারিশ আছে। আশা রাখি গবেষণাটি সরকারি আধিকারিক , নীতি নির্ধারক মন্ডলী, সংশ্লিষ্ট অংশীদার সমূহ, এবং যে সকল ব্যাক্তির জীবন অভিজ্ঞতা এই বই তুলে ধরেছে, তারা সকলে এই বই পড়বে। আশা রাখি এই স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার আমলে, এই বই নানা প্রশ্ন ও আলোচনা তৈরি করবে। আমাদের সবারই জোটবদ্ধ হওয়াটা খুবই দরকার।

সিন্টু, আয়েশা, এবং এই গবেষণায় যুক্ত বাকি সকলের প্রতি রইল আমার শুভকামনা।

সায়ন ভট্টাচার্য,
সহকারী অধ্যাপক,

হ্যারিয়েট টাবম্যান ডিপার্টমেন্ট অফ উইমেন, জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি স্টাডিজ,
ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড, কলেজ পার্ক।

অন্ধকার রাতে তারার আলো

সিন্টু'র গল্প

আমি ২০০৩ সালে স্কুল থেকে ড্রপ আউট করেছি। কিশোর বয়সে পড়াশোনাতে ঠিক মন বসছিল না। থাকি যৌনপল্লীতে, সেটার জন্য স্কুলেও অনেক ডিসক্রিমিনেশন ফেস করতে হচ্ছিল। তখন তো এত স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং বা এনজিওর সাপোর্টও ছিল না।

২০০৩ সালেই একটা দোকানে কাজ ধরলাম। বাড়িতে তখন অনেকজন ছিল। আমি আমার মা, বাবা, দিদা। বেশ খরচা ছিল। তখন সেই দোকানে কাজ করে আমি মাসে চারশ থেকে পাঁচশ টাকা করে পেতাম। সেই কাজেও অনেক ডিসক্রিমিনেশন ফেস করতে হত। মালিক কিন্তু সাপোর্টিভ ছিল।

তারপরে একটু বেশি টাকার জন্য একটা প্লাইউডের ফ্যাক্টরিতে কাজে জয়েন করলাম। বারো ঘণ্টার ডিউটি করে দিনের শেষে সত্তর টাকা করে পেতাম। ওইখানে দু-তিনজন কমিউনিটির মানুষও ছিল। কারখানা কাজ করতে গিয়ে অনেক ভাবে হেনস্থার শিকার হয়েছি। কিছু স্টাফরা গায়ে অনেক জায়গাতে হাত দিত, দুধ টিপে দিত। সুপারভাইজারের চামচারা আমাকে অনেক হেনস্থা করত। আমাকে দিয়ে বেশি কাজ করাত। অনেক রাত অব্দি কাজ করতাম। নিয়ম অনুযায়ী বেশি কাজ করলে ওভারটাইম পাওয়ার কথা। কিন্তু ওরা আমাকে পুরো টাকাটা দিত না। টাকা কেটে নিত। ফ্যাক্টরিটাও বাড়ি থেকে অনেকটাই দূর ছিল। দশ টাকা অটো ভাড়া হত, কিন্তু টাকা বাঁচানোর জন্য হেঁটে যেতাম।

তারপরে মার্বেল টাইলস বসানোর কাজে জয়েন করলাম। আট ঘন্টা ডিউটি করে আশি টাকা পেতাম দিনে। ট্রেনে ধস্তাধস্তি করে উত্তরপাড়া অব্দি যেতাম, তারপরে বাকিটা হেঁটে যেতাম। কনট্রাক্টর তারপর আরেক জায়গায় কাজে পাঠাত। কন্ট্রাক্টর এর ভাই খুব বৈষম্য করত, প্রচুর গালাগালি করত। রাজমিস্ত্রিরা কাজ করতে দিত না। সারাদিন আমাকে দিয়ে বালি তোলাত। খেতে দিত না, বিশ্রাম নিতে দিত না।

সেই কাজও ছেড়ে দিলাম। ইনকাম না থাকলে কী করে বাড়িতে টাকা দেব? তখন আবার বাড়িতে মানসিক অত্যাচার শুরু হল। বাড়িতে এরকমও বলা হল কি আমি নাকি বাড়িতে বসে বসে খাচ্ছি। তখন আমি অনেক কাঁদতাম। আবার দোকানের কাজে ফিরে গেলাম। তখন আমার মাইনে হল মাসে সাতশ টাকা। তার সাথে প্রতিদিন দশ টাকা করে পেতাম টিফিনের জন্য। কিন্তু টাকাটা যথেস্ট হত না। দুই বছর ওইখানে কাজ করলাম

আবার প্লাইউড ফ্যাক্টরির কাজে ফিরে গেলাম। তখন বার ঘন্টা ডিউটি করে দিনে আশি টাকা করে পেতাম। সেখানে আমাকে নাইট ডিউটি দিল। আমাদের বাড়ি থেকে ফ্যাক্টরি প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে। তখন গৃহস্তপাড়াতে বাড়ি ভাড়া নিলাম। আমার বিকেল ছয়টা থেকে ভোর পাঁচটা অব্দি ডিউটি ছিল। কারখানার বিভিন্ন হেড লোকেরা আমাকে দিয়ে ওদের পার্সোনাল ফাই-ফরমাস খাটাত। অনেক শারীরিক অত্যাচারও করত। স্টোর ম্যানেজার যৌন হেনস্থা করত, যেখানে-সেখানে টিপে দিত, আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিত।

কারখানাতে কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় গায়ে কেমিক্যাল পড়ে ঘা হয়ে যেত। এখনো তার দাগ আছে।

কারখানার কাজের সাথে সাথেই যৌনপল্লীতে বাড়ি ধোয়ার কাজও ধরলাম। কারখানাতে নাইট ডিউটি শেষ করে সাত কিলোমিটার হেঁটে যৌনপল্লীতে আসতাম। এসে বাড়ি ধুতাম। তারপরে বাজার করে সাত কিলোমিটার হেঁটে আবার ভাড়াবাড়িতে যেতাম। বাড়ি গিয়ে ঘুমোতাম আর দিদি ও দিদা রান্না করে দিত। দুটো-আড়াইটা বাজলে ঘুম থেকে তুলে দিত। মাকে খাবার দিতে সেখান থেকে হেঁটে আবার যৌনপল্লী আসতাম। তারপর আবার ছয়টার সময় হেঁটে হেঁটে কারখানায় যেতাম। বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসের গরমে আমার খাবার অনেকদিন নষ্ট হয়ে যেত। ২০০৯ সালে কারখানার কাজটা ছেড়ে দিলাম।

ছোটবেলায় দুর্বারের (দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি) আন্দোলনে যেতাম। ওদের বিভিন্ন সমাবেশে অংশ নিতাম, তা সে প্রোটেস্ট হোক বা সেলিব্রেশন। ২০০৯ সালে দুর্বার থেকে পিয়ার এডুকেটার হিসেবে কাজে যোগ দিলাম। তখন মাইনে হল মাসে পনেরশ টাকা। ছয় বছর সেই কাজটা করলাম। দুর্বারেই মুভমেন্ট বিল্ডিং শিখলাম। ২০১২ সাল থেকে জাগরন করা শুরু করলাম। ২০১৪ সালে দুর্বারের টার্গেট ইন্টারভেনশন (টিআই) প্রজেক্টে ডাইরেক্টর হিসেবে জয়েন করলাম। তখন মাইনে বেড়ে হল মাসে ছয়হাজার টাকা।২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল অবদি হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, এই চার জেলাতে টিআই ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করলাম। ২০১৫ সালে বলরাম দে আনন্দম সংগঠনে সেক্রেটারি হিসেবে জয়েন করলাম। ওইখানে আমাকে অনেক সমস্যা ফেস করতে হল। অনেক মেন্টাল ট্রমার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। ২০১৬ সালে আমি দুর্বার ছেড়ে দিলাম।

তখন চিন্তা ছিল যে, কীভাবে দিন চলবে? আমাদের ওইখানে মুরগির চামড়া বিক্রি হয়। সেটা রান্না করে বিক্রি করতে শুরু করলাম। সেটা খুব ভালই বিক্রি হচ্ছিল। তখন খোঁজ খবর নিয়ে বাড়ি থেকেই একটা হোম কিচেন খুললাম। সকাল ছটায় বাজার করে এনে রান্না করতাম। আমার দিদি আর দিদা দুজনেই রান্নাতে সাহায্য করত।

২০১৬ সালে 'আনটিল অ্যান্ড আনলেস' বলে একটা ডকুমেন্টারি ফিল্মে সহ-নির্দেশক হিসেবে কাজ করলাম। এই সিনেমাটা ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়ার সাথে দুবছরের কোলাবরেশনে তৈরী। ২০১৮ সালে এই ডকুমেন্টারিটা শোকেস করতে আমি আমেরিকা পাড়ি দিলাম।

২০১৮ সালেই যখন দুর্বারে পিআরইপি (প্রি এক্সপোজার প্রোফিল্যাক্সিস) প্রজেক্ট শুরু হলো, তখন আবার ওইখানে জয়েন করলাম। কিন্তু তখন দুর্বারে কাজ করতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। সাস্টেনেবিলিটি কিছু ছিল না। ২০১৯ সালে তখন আবার আমি দুর্বার

থেকে বেরিয়ে 'কলকাতা আনন্দম ফর ইকুয়ালিটি অ্যান্ড জাস্টিস' সংগঠনটি তৈরি করলাম আর এখানেই সেক্রেটারি হিসেবে জয়েন করলাম।

২০২০ সালে কোভিড নাইন্টিন এর লক ডাউন শুরু হল। খুব অশান্তিতে ছিলাম। কিভাবে সারভাইভ করব। তার সাথে সাথে এটাও ভাবছিলাম যে যৌনপল্লীর মেয়েরা বা ট্রান্স কমিউনিটির মানুষজন কীভাবে সারভাইভ করবে? সোমাভা ক্রাউড ফাইন্ডিং করে পঁচিশ হাজার টাকা তুলে দিল, সেটাতে পঁচিশ জন বয়স্ক যৌনকর্মীদের রেশন পৌঁছে দিলাম। তারপর, আমি এবং আরো কয়েকজন মিলে বিভিন্ন জেলার শহরে ও গ্রামে ঘরে ঘরে রেশন পৌঁছে দিয়েছি। তখনই আমি কোভিডে আক্রান্ত হলাম। তখন ট্রান্স মানুষের জন্য সেফ হাউসের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই আমি বাড়িতেই ছিলাম। দুই বছরে আমরা প্রায় পাঁচশজন বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক মানুষের ঘরে রেশন পৌঁছে দিয়েছি। আমিও রেশনই খেতাম।

২০২১ সালে এ আমার ভাগ্নি মারা গেল। আমি একটু ডিপ্রেশনেও ভুগছিলাম। কিছু ধারদেনা হয়ে গেছিল। কিভাবে শুধব বুঝতে পারছিলাম না। তখন অনেক মানুষ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সাহায্য করেছে।

ধীরে ধীরে কলকাতা আনন্দম বড় হল। আমিও আস্তে আস্তে একটা জায়গা পেলাম। লোকজন আমাকে চিনল। একটু রিসার্চ এর কাজ শুরু করলাম। লাস্ট দুই বছরে কিছু ফেলোশিপ আর রিসার্চ কনসালটেন্সিতে সুযোগ পেলাম, যেটার ইনকাম থেকে লোন শোধ করলাম। আরেকটা লোনে একটা বাড়ি কিনতে পেরেছি। কিন্তু এখন তো আর এমন ফেলোশিপ নেই। আগামী দিনে কিভাবে চলবে? আমার জীবনের স্থিতিশীলতা কই? তাও ব্যালেন্স করে চলার চেষ্টা করছি?

অনেক আন্দোলন করে কিছুটা ক্ষমতায়ন হয়েছে, আরও কিছু বাকি আছে।

আলাপ

এই বইটি বানানোর গল্প

তৃণমূল স্তরের রূপান্তরকামী মানুষদের জন্য ক্ষমতায়ন কী তা বোঝার এটি একটা ছোট্ট প্রচেষ্টা। এই বইয়ের মাধ্যমে আমরা উপরিউক্ত মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কয়েকটি গল্প তুলে ধরতে চেয়েছি।

বইটি লেখার জন্য যা গবেষণা ও বিশ্লেষণ লেগেছে সেটা আমরা দুজন সিন্টু ও আয়েশা একসাথে করেছি।

সিন্টু (সিন্টু বাগুই) একজন ট্রান্স অ্যাক্টিভিস্ট, যে অনেকদিন থেকেই গবেষণা পরিকল্পনা ও পরিচালনায় আগ্রহী। আর আয়েশা একজন অধ্যাপক যে কমিউনিটির সাথে অংশগ্রহণ ভিত্তিক গবেষণার উপর কাজ করতে ইচ্ছুক।

সিন্টু তৃণমূল স্তরের রূপান্তরকামী মানুষদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছে প্রায় কুড়ি বছর। বিভিন্ন বেসরকারি সমাজসেবামূলক সংস্থার (এনজিও) সাথে কাজ করতে করতে সিন্টু অন্য আরো গবেষক বা অধ্যাপক দের গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের কাজে সহযোগিতা করেছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি কী করে ছাত্রদের একা এবং একঘরে করে দেয় সেটাই আয়েশার গবেষণার মূল বিষয়। বর্তমানে আয়েশা তৃণমূল স্তরের রূপান্তরকামী মানুষদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণভিত্তিক কাজের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করছে

সেই সূত্রে ২০২২ সালে আয়েশা, সমভাবনা নামক আরেকটি তৃণমূল বেসরকারি বেসরকার সংস্থার সাথে কলকাতায় একদিনের অবদমিতের নাট্যশালার কর্মশালার আয়োজন করে।

সেখানেই আমাদের দুজনের আলাপ হয়। অধ্যাপক বা গবেষকরা অনেক সময়ই প্রান্তিক স্তরের মানুষদের সাথে কীভাবে খুব দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে আচার ব্যবহার করে সেটা নিয়ে বিকেলের দিকে ফাঁকা সময়ে সিন্টু, আয়েশা এবং অন্যান্যদের সাথে কথা বলে।

এই কথোপকথনের মাধ্যমে আমাদের মনে হয় যে আমাদের চিন্তা ভাবনাতে অনেকটাই মিল আছে। প্রান্তিক স্তরের মানুষরা এবং অধ্যাপকরা কিভাবে একে অপরের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে পারে, এবং যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে তা নিয়েও আমাদের মতের অনেকটাই মিল ছিল।

এভাবেই আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম, আর প্রায়ই আমরা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে

থাকলাম। মাঝে মাঝেই সিন্টু জানাতো যে ওর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা গবেষণা করার খুব ইচ্ছা। গবেষণার প্রশ্নাবলী তৈরি থেকে, তথ্য বিশ্লেষণ থেকে, পর্যালোচনা পর্যন্ত পুরোটাই সিন্টু করতে চায়। আমরা তাই তখন থেকেই একসাথে কাজ করার চেষ্টা করছি।

এরকমই একদিন আমরা গল্প করছিলাম যে রূপান্তরকামী নারীদের মেকআপ ও সাজসজ্জার জন্য কত বেশি বেশি খরচ করতে হয়। এমন মনে হয় যে, আমরাই যেন পয়সা দিয়ে কসমেটিক্স কোম্পানিগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছি। এই কোম্পানিরা কিন্তু আমাদের ঘুরেও দেখেনা। আমাদের আনুমানিক হিসেবে একেক জন রূপান্তরকামী মহিলা মাসে গড়ে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা এই মেকআপ, কসমেটিক্স, আর গয়নাগাটির পেছনে খরচ করে।

আজকাল শরীরকে পরিবর্তন করার বিভিন্ন পদ্ধতি বা প্রোডাক্ট বাজারে চলছে। হরমোন থেরাপি, লেজার হেয়ার রিমুভাল, বিভিন্ন অস্ত্রোপচার, ইত্যাদি। কিন্তু সবকিছুই খরচা সাপেক্ষ। সম্মিলিতভাবে আমরা ট্রান্স কমিউনিটির মানুষরা একটা বেশ মোটা অঙ্কের টাকাই এই কোম্পানি বা ডাক্তারদের হাতে তুলে দিচ্ছি।

এই আলোচনা থেকে আরও অনেক প্রশ্ন উঠে এলো। সবাই কী এই খরচাটা স্বেচ্ছায় করছে? রূপান্তরকামী মানুষদের নিজের শরীর পরিবর্তনের জন্য যে খরচাটা করতে হয় সেটাও কি এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা খাজনা নয়? আমাদের রূপান্তরটাও কি পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত একটি অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নয়?

রূপান্তরকামী মানুষজন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই পুঁজিবাদী-পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কাছে নানা রকম বঞ্চনার শিকার হয়। তা সত্ত্বেও তাদের বেঁচে থাকার তাগিদে, এই সমাজ ব্যবস্থার সাথে মানিয়ে চলতে হয়। আর হয়তো সেই বেঁচে থাকার তাগিদেই আমাদেরকে কোম্পানি থেকে শুরু করে, ডাক্তার, পরিবার, এমনকি জীবনসঙ্গীকেও টাকা দিয়ে জয় করতে হয়।

এই পুঁজিবাদী-পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তৃণমূলস্তরের রূপান্তরকামী মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থা কীরকম? আমরা জানি যে কোভিডের লকডাউন এর সময় কমিউনিটির মানুষজনদের খুবই দুরাবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। অনেকের চাকরি গেছে। অনেককে তাদের দোকান বা ব্যবসা বন্ধ করতে হয়েছে। কোভিডের পরে তারা কী করে পায়ের তলায় মাটি পেল? তাদের অর্থনৈতিক দূরবস্থা কি কেটেছে? কী কী সমস্যার সম্মুখীন তাদের হতে হয়েছে? তাদেরকে কি পেশা বদল করতে হয়েছে? কতজন এখনো নানা দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে? আমাদের জানাশোনার মধ্যে আমরা কতগুলো গল্প আগেই শুনেছি, কিন্তু আমাদের আরো গল্প শোনার দরকার ছিল।

বেশিরভাগ বয়স্ক রূপান্তরকামী মানুষদের সঞ্চয় খুব কম। কিন্তু কম বয়সীদের কি অবস্থা? তারা ক ভবিষ্যতের কথা ভেবে সঞ্চয় করছে? তাদেরকে সঞ্চয়ের ব্যাপারে বলার বোঝানোর বা শেখানোর কি কেউ আছে? তারা কি জানে কোন প্রকল্পে টাকা রাখতে হয়? সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সাহায্য কি তারা পায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছতে এদের কি কি বাধা লংঘন করতে হয়?

আমাদের মত মানুষদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও স্থিতিশীলতা খুবই দরকার। আমাদের যদি খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদাগুলি নিরাপত্তার সাথে পরিপূর্ণ হয়, তাহলেই তো আমরা মর্যাদার সাথে বাঁচার লড়াইটা করতে পারব। নিজেদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে পারব। জুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারব। নিজেদেরকে আরো শিক্ষিত করতে পারব। অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকলে পরিবারেরও পাশে দাঁড়ানো সহজ হয়ে ওঠে। আমাদের মর্যাদা ও অধিকারের লড়াইয়ের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হওয়াটা খুব জরুরী। কিন্তু তা বলে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন হলেই যে সব নির্যাতন একা একা থেমে যাবে, তার কোন মানে নেই। কারণ লিঙ্গ, বা বর্ণ, বা জাতি, বা অক্ষমতার ভিত্তিতে ভেদাভেদ আমরা করছিই। পয়সা থাকলেও সেই ভেদাভেদ মুছে যায় না। সমাজের সবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই ভেদাভেদ গুলির মোকাবিলা করা খুবই প্রয়োজন। না হলে শুধু ইতিপূর্ব অগ্রসর শ্রেণীর কয়েকজনেরই উন্নয়ন হবে।

আমরা তৃণমূল স্তরে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রায় দেখছিই না। কয়েকজন আর্থিকভাবে হয়তো স্থিতিশীল হতে পারছে, কিন্তু, বেশিরভাগ লোকজনই এই পুঁজিবাদী যাঁতাকলে শোষিত হচ্ছে। লকডাউনের পরে প্রচুর ট্রান্স লোকজনকে কর্ম বদল করতে হয়েছে। অনেকের প্রচুর ধার দেনা হয়ে গেছে। অনেকের এখনো স্থায়ী কোন চাকরি নেই।

বেশিরভাগ ট্রান্স লোকজনই দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। এরকম জুলুমবাজ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। এই সমাজব্যবস্থার প্রতিরোধ ও পরিবর্তন করতে আমরা কি জোটবদ্ধ হতে পারি?

আমরা এই প্রশ্নগুলোর একটা তদন্ত করতে চেয়েছিলাম।রূপান্তরকামী মানুষদের উপর হওয়া গবেষণায়, তৃণমূল স্তরের ট্রান্স মানুষদের কন্ঠ প্রাধান্য পায় না। তাদের নিলেও তাদের শুধু সাক্ষাৎকারের অংশগ্রহণকারীর পর্যায়ে রাখা হয়, বিশ্লেষণটা করে সুবিধাভোগী গবেষকরাই। আমরা মনে করি গবেষণায় তৃণমূল স্তরের কন্ঠগুলিকে মর্যাদার সাথে প্রতিনিধিত্ব দিতে হলে, গবেষণার নিয়ন্ত্রণ তৃণমূল স্তরের মানুষের হাতে থাকা জরুরী। গবেষণার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে পারার ক্ষমতা, তৃণমূল স্তরের মানুষদের হাতে থাকা প্রয়োজন।

আমরা এই কাজটা উপরিউক্ত কথাগুলো মনে রেখেই করতে নেমেছি। শুরুর দিকে

আমাদের কাছে কোন ফান্ডিং ছিল না। তাই আমরা দশ জনের একটা ছোট্ট স্টাডি ডিজাইন করেছিলাম। প্রায় একমাস পর আমরা ইউসিএলএ (ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, লস এঞ্জেলেস) এর উইলিয়ামস স্কুল অফ ল এর অধীনস্থ, এলজিবিটিকিউপ্লাস সিড গ্র্যান্ট এর সম্পর্কে জানতে পারি। তখন আমরা আমাদের আইডিয়াগুলো, রায়না রায়ের সাথে ডিসকাস করলাম। রায়না আমাদের দুজনেরই বন্ধু এবং কলকাতার ট্রান্স মুভমেন্টের এক অন্যতম নেত্রী। কমিউনিটির মানুষদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়ে আমরা রায়নার সাথে আগেও কথা বলেছি। রায়না আর সিন্টু প্রোপোজালটা সাবমিট করল। এই প্রোপোজালে আয়েশা এবং পূজা বালসুব্রহ্মনিয়ম নামে একজন অর্থনীতিবিদ, উপদেষ্টা হিসেবে যুক্ত হল। সৌভাগ্যবশত এই প্রোপোজালটি ফান্ডিং এর জন্য অনুমোদিত হল। আর সেই জন্যই আমরা আরেকটু বেশি বাজেটে, আরেকটু বড় করে গবেষণাটা করতে পারলাম। দুর্ভাগ্যবশত স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার দরুন রায়না এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে অপারগ থাকল।

আমরা সব মিলিয়ে ঊনচল্লিশটা সাক্ষাৎকার করেছি। সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে বিভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়, জাতি, প্রতিবন্ধকতা, ও আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব ছিল। আমাদের বিশ্লেষণ থেকে আমরা তেরটা গল্প রচনা করেছি। এই গবেষণার মাধ্যমে আমরা বহু কমিউনিটির মানুষের গল্প শুনতে সক্ষম হয়েছি। সেই অভিজ্ঞতাটিকে আমরা অমূল্য মনে করি। এই কাজটা করতে করতে আমরা যা শিখেছি সেটাই কিছুটা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। এই কাজটা আমরা চালিয়ে নিয়ে যেতে চাই, কারণ, এরকম আরো গল্প বলা বাকি আছে। এই বইটা লেখার আরেকটা বড় কারণ হল, আমরা তৃণমূল স্তরের আরো মানুষকে এরকম গবেষণায় উৎসাহিত করতে চাই এবং চাই যে তথাকথিত শিক্ষা জগতের গবেষকরা এসে এদের পাশে দাঁড়াক।

এর পরবর্তী অধ্যায়ে কি করে এই কাজটা আমরা করলাম সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি। সেখানে পাবেন আমাদের তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া, এবং আমরা কী করে উঠে আসা বিভিন্ন সমস্যা পেরলাম।

তার পরবর্তী 'এক নজরে' অধ্যায়ে আমরা পরিবেশন করছি আমাদের সব সাক্ষাৎকারীদের নিয়ে একটি সম্মিলিত প্রোফাইল। যেখানে আমরা সংগৃহীত তথ্যগুলিকে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীতে ভাগ করে পরিবেশন করছি । কতগুলি এরকম শ্রেণীর উদাহরণ হল জাতি লিঙ্গ বয়স প্রতিবন্ধকতা পেশা আয় ইত্যাদি এই তথ্য বিশ্লেষণ করে পাওয়া পর্যবেক্ষণ গুলিও আমরা এই অধ্যায়েই লিখেছি।

'দুঃখ শেষে সুখের হাসি' থেকে 'বাঁধভাঙ্গার গল্প' অধ্যায়গুলিতে আমরা রেখেছি অংশগ্রহণকারীদের বলা তেরোটি গল্প।

তারপর পরিশেষে অধ্যায়ে আমাদের গবেষণার পর্যবেক্ষণ নিয়ে লিখেছি। তার সাথে সাথে গবেষণা আর সামাজিক নীতির উপর এর প্রভাব নিয়ে কিছুটা কথা বলে, এই বই এর ইতি টেনেছি।

আমরা আপনাদের মতামত জানতে আগ্রহী। আপনাদের মতামত আপনারা sintucan@gmail.com এ পাঠাতে পারেন।

ধন্যবাদান্তে,
সিন্টু ও আয়েশা

আমরা কাজটা কিভাবে করলাম

এই গবেষণাটির পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তৃণমূল পর্যায়ের রূপান্তরকামী মানুষদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বোঝা। এই মানুষেরা কীভাবে তাদের জীবনে ক্ষমতায়ন অর্জনের চেষ্টা করছেন এবং তারা কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন? তারা কীভাবে সেই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করছেন? এবং এই মানুষেরা সেই ক্ষমতায়নকে কীভাবে বোঝেন?

এটি করতে, আমাদের কোনো স্পষ্ট উত্তর ছাড়াই অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, আমরা কতজনের সাক্ষাৎকার নেব? আমাদের গবেষণায় কোন কোন জেলার মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করব? সাক্ষাৎকারে আমরা কী ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই? এবং কোন কোন বিষয়ে? ও আমরা মোট কতগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই? কারণ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের গবেষণার ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলবে। সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নগুলোর উপর ভিত্তি করে অংশগ্রহণকারীরা এক প্রশ্নের বিভিন্ন রকম ভাবে উত্তর দিতে পারে। যেমন, আমি যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করি, "তোমার কাজ কেমন চলছে? তুমি কি কিছুটা খুলে বলতে পার?" তাহলে সে হয়তো একটি গল্পের মতো করে উত্তর দেবে। কিন্তু আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কি তোমার কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা অনুভব কর?" এবং একটি খোলা ফর্ম হাতে নিয়ে অংশগ্রহণকারীর সামনে টিক চিহ্ন দিতে বসে থাকি, তাহলে হয়ত অংশগ্রহণকারী বিস্তারিত ব্যাখ্যা না দিয়ে শুধু "হ্যাঁ/না"-এর মতো সংক্ষিপ্ত উত্তর দেবে। এর কারণ হলো, অংশগ্রহণকারীরাও সাক্ষাৎকারগ্রহীতার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে যে তাদের কতটা কথা বলা উচিত এবং তারা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা বলছে কিনা।

সাক্ষাৎকারের প্রশ্নমালা তৈরি করার সময়ে, তখন প্রাথমিকভাবে আমাদের কাছে অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল। প্রায় তিরিশটি প্রশ্ন। আর প্রশ্নগুলো দেখে মনে হচ্ছিল আমরা অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে শুধু সংখ্যাভিত্তিক তথ্য চাইছি, তাদের গল্প নয়। আমরা আমাদের সহকর্মী পূজা বালাসুব্রহ্মনিয়াম ও তথাগত সেনগুপ্তের সাথে এবং চেন্নাইয়ের C-SHaRP এর আইআরবি পর্যালোচনা কমিটির সাথেও এই বিষয়ে কথা বলেছি। অনেক কিছু ভেবে দেখার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা এমন এগারটি প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করব যা থেকে সংক্ষিপ্ত উত্তর এবং সংখ্যাভিত্তিক তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, এবং বাকি প্রশ্নগুলো এমন হবে যাতে আমরা অংশগ্রহণকারীদের গল্প শুনতে পারি এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারিতভাবে বুঝতে পারি। নিচের বাক্সে একটি প্রশ্নের উদাহরণ দেখানো হলো:

প্রাথমিকভাবে, আমরা অনেক মানুষের সাক্ষাৎকার নেব বলে ঠিক করেছিলাম। আমরা মনে করছিলাম যে এতে আমাদের কমিউনিটিরর বৈচিত্র্যের ভালো প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত। কিন্তু সেটা করলে, সাক্ষাৎকার থেকে কেবল সংখ্যাগত তথ্যই উঠে আসত। আমরা সাধারণ মানুষের গল্পগুলো জানতে পারতাম না। এই গল্পগুলোর খুবই দরকার,

কারণ বুদ্ধিজীবীরা, সরকার, এনজিওগুলি, অ্যাক্টিভিস্টরা এবং সমাজসেবীরা সকলেই কমিউনিটির জন্য ক্ষমতায়নের অর্থ সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এতে প্রায়শই তৃণমূল স্তরের মানুষের কথাগুলি হারিয়ে যায়। তাদের নিজস্ব গল্পের মাধ্যমেই সেই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো তুলে ধরা সম্ভব। একারণেই আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম যে আমরা একশজন মানুষের সাক্ষাৎকার নেব, যাতে তাদের গল্পগুলো তুলে ধরা যায়। কিন্তু যখন আমরা কাজটি শুরু করলাম, তখন দেখলাম যে বিশ্লেষণটি ভালোভাবে করতে হলে আমরা এতগুলো সাক্ষাৎকার নিতে পারব না। অবশেষে, আমরা ঊনচল্লিশটি সাক্ষাৎকার নিয়েছি এবং এই বইটিতে আমরা তেরটি গল্প অন্তর্ভুক্ত করেছি।

প্রথম চব্বিশটি সাক্ষাৎকার সিন্টু নিয়েছিল। এই অংশগ্রহণকারীরা হুগলি ও কলকাতা জেলার বাসিন্দা ছিলেন। সাক্ষাৎকারগুলো অডিও রেকর্ড করা হয়েছিল। এই চব্বিশটি সাক্ষাৎকারের পর, আমরা প্রায় দশটি সাক্ষাৎকারের অডিও রেকর্ড একসাথে শুনেছিলাম এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমরা লক্ষ্য করলাম যে অনেক অংশগ্রহণকারী প্রশ্নগুলোর বেশ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছিলেন। আমাদের মনে হয়েছিল যে আমরা তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন দিয়ে শুরু করছিলাম বলেই এরকম উত্তর পাচ্ছিলাম। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে বাকি সাক্ষাৎকারগুলোর শুরু থেকেই অংশগ্রহণকারীদের বলব যে আমরা তাদের গল্প শুনতে আগ্রহী। আমরা তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন দিয়ে শুরু করব না, তবে সেগুলো শেষে অন্তর্ভুক্ত করব। আমরা আশা করেছিলাম যে কিছু সংখ্যাগত তথ্যও গল্পের মধ্যে চলে আসবে। আমরা আরও সিদ্ধান্ত নিলাম যে আয়েশা এবং সিন্টু দুজনেই একসাথে সাক্ষাৎকার নেবে। এই সময়েই আমরা পশ্চিমবঙ্গের মালদা এবং দার্জিলিং জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিই। যাতে আমরা আলাদা আলাদা প্রেক্ষাপটের গল্প শুনতে পাই। মালদায় আমরা দেবী আচার্যের (মালদা পরিচয়) সাথে এবং শিলিগুড়ি, দার্জিলিং জেলায় প্রবীর ঘোষের (উত্তর ফাল্গুনী সোসাইটি, শিলিগুড়ি) সাথে কাজ করেছি।

মালদা এবং শিলিগুড়ির সাক্ষাৎকারের পরিবেশ আগেরগুলোর থেকে বেশ ভিন্ন ছিল। হুগলি এবং কলকাতায় সাক্ষাৎকারগুলো কারো বাড়িতে (সিন্টুর, অংশগ্রহণকারীদের, এমন একজন যাকে দুজনেই চেনে, মৈত্রেয়ীর বাড়িতে) বা কোনো স্থানীয় ক্যাফেতে নেওয়া হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারগুলোর সময় কেবল সিন্টু এবং অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিল। এর বিপরীতে, মালদা এবং শিলিগুড়ির অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকারের জন্য আমাদের হোটেলের ঘরে আসার আমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছিল। আর শিলিগুড়িতে, কয়েকটি ক্ষেত্রে দুজন অংশগ্রহণকারী একসাথে সাক্ষাৎকারের জন্য এসেছিল। শিলিগুড়িতে প্রবীর ও এবং মালদায় দেবী সাক্ষাৎকারগুলোর সময় আমাদের সাথে ছিল। আর শিলিগুড়ি ও মালদা উভয় জায়গাতেই,লেখালিখির কাজে সাহায্যের জন্য আমাদের সাথে ছিল ঋ (এই বইয়ের সম্পাদক)। একারণেই মালদা এবং শিলিগুড়িতে সাক্ষাৎকারগুলোর সময় ঘরে পাঁচ-ছয় জন করে উপস্থিত ছিল ।

আমরা আমাদের গবেষণায় বিভিন্ন পেশা, লিঙ্গ পরিচয় এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমরা এই লক্ষ্যটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারিনি। আমাদের অংশগ্রহণকারীদের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য আমরা তাদের সবার সম্মিলিত একটি প্রোফাইল তৈরি করেছি। এটি পরবর্তী অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকারগুলো নেওয়ার পর আমরা বিশ্লেষণ শুরু করি। মাঝে মাঝে আমরা এটা অনলাইনে করতাম। যখন সম্ভব হতো, আমরা এই কাজটি করার জন্য কোনো ক্যাফেতে বা আমাদের দুজনের যেকোনো একজনের বাড়িতে চলে যেতাম। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল যে সিন্টু যাতে বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ার সমস্ত দিকেই অংশগ্রহণ করতে পারে। আমরা প্রতিটি সাক্ষাৎকারের রেকর্ডিং একসাথে শুনতাম। শোনার সময়, আয়েশা সাক্ষাৎকারের কথোপকথনটি মনে রাখার জন্য কিছু সংক্ষিপ্ত নোট তৈরি করত। এই নোটগুলো পরবর্তী বিশ্লেষণে সাহায্য করেছিল। প্রতিটি সাক্ষাৎকার শোনার পর, আমরা আলোচনা করতাম যে অংশগ্রহণকারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কে কীভাবে কথা বলেছে, তারা কীভাবে নিজেদের ক্ষমতায়িত করার চেষ্টা করছে, তারা কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, এবং কী ধরনের সহায়তা পাচ্ছে। আমরা এই আলোচনাগুলিও নোট করতাম। সমস্ত সাক্ষাৎকারের জন্য এই প্রাথমিক বিশ্লেষণ শেষ হওয়ার পর, আমরা কয়েকটি গল্পনির্বাচন করি যেগুলি ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে পেশ করেছে। আমরা এটাও চেষ্টা করেছি যে সম্মিলিতভাবে কেসগুলো যেন বিভিন্ন পেশা, স্থান, লিঙ্গ, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে।

সমাজবিজ্ঞান গবেষণার প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর জন্য প্রায়শই এমন কিছু রিসোর্সের প্রয়োজন হয় (যেমন প্রশিক্ষণ, সময়, এবং সময়ের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক) যা আমাদের কাছে ছিল না। আমরা বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটিকে তৃণমূল স্তরের মানুষের কাছে সহজলভ্য করতে চেয়েছিলাম, যাতে আরও বেশি তৃণমূল স্তরের মানুষ এই ধরনের গবেষণায় অংশ নিতে পারে।

বইতে দেওয়ার জন্য সাক্ষাৎকারগুলিকে চিহ্নিত করার পর, সেই সাক্ষাৎকারের কথোপকথনের নোটগুলো পর্যালোচনা করতাম এবং সেই সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি মনে করার চেষ্টা করতাম। এরপর সিন্টু তার নিজস্ব শৈলীতে গল্পটি একটা টেকে অডিও রেকর্ড করত। আগে আমরা বেশ কয়েকবার এই পদ্ধতিটিকে পরীক্ষা করে তবেই এই প্রক্রিয়াটিকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করি। ঋ কেস স্টাডিগুলোর অডিও রেকর্ডিংগুলো প্রতিলিপি করল। তারপর আয়েশা এবং ঋ কেস স্টাডিগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করল। আমরা ইংরেজি সংস্করণগুলো বারবার মিলিয়ে দেখেছি, সাক্ষাৎকারের কথোপকথনের নোটগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখেছি, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পাদনা করেছি। শেষ সম্পাদনার কাজটি করেছে ঋ এবং ও ইংরেজি এবং বাংলা সংস্করণে উপযুক্ত

পরিবর্তনগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা সেটা নিশ্চিত করেছে। সিন্টুও সব বাংলা সংস্করণগুলোর পর্যালোচনা করেছে। ইংরেজি এবং বাংলা সংস্করণগুলো আক্ষরিক অনুবাদ নয়, তবে আমরা অর্থ এবং আবেগ একই রাখার চেষ্টা করেছি।

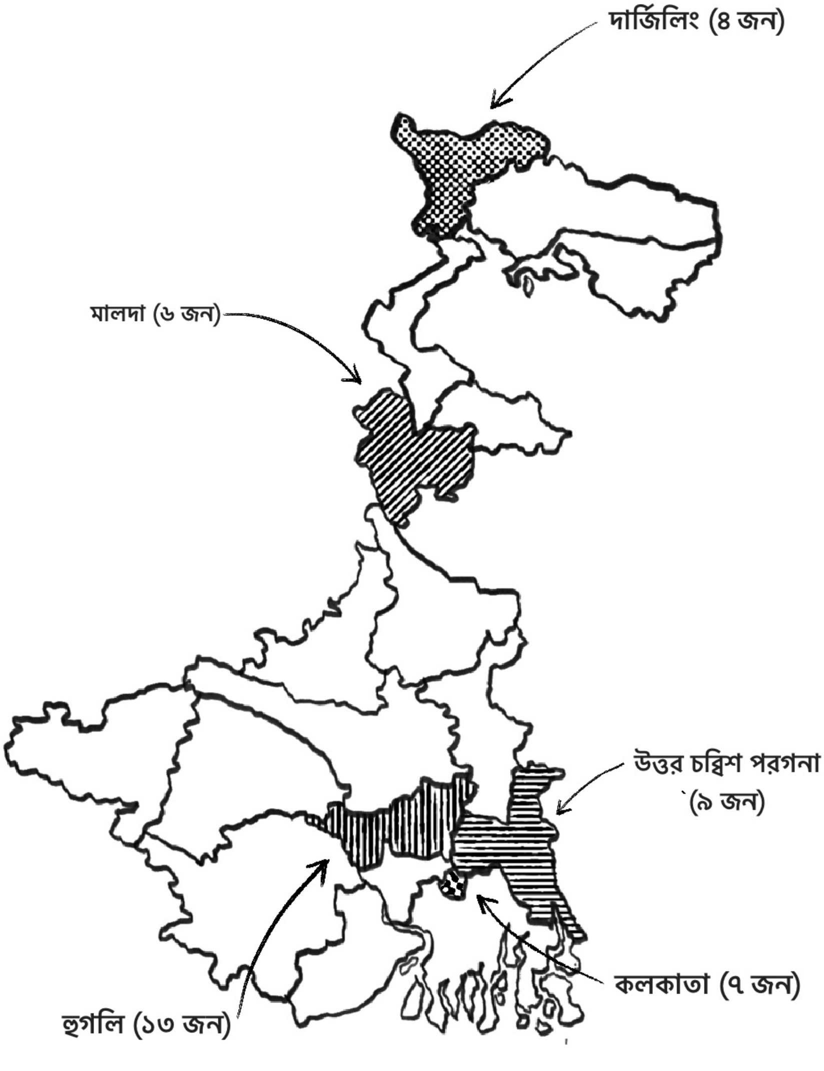
এরপর আমরা গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের প্রোফাইল তৈরি করলাম। আমরা একটি বড় চার্ট পেপারে বয়স, লিঙ্গ, জাতি, বার্ষিক আয় ইত্যাদি কলামসহ একটি টেবিল তৈরি করলাম। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর জন্য একটি করে সারি ছিল, যেখানে আমরা তাদের বিস্তারিত তথ্য লিখলাম। সেখান থেকে আমরা প্রোফাইলের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সংখ্যা গণনা করেছিলাম। কাগজে কাজ করার সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল যে, স্প্রেডশিট সফটওয়্যার জানাটা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে না। ঋ আমাদের ডেটা ব্যাখ্যা করতে এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন তৈরি করতে সাহায্য করেছিল।

এক নজরে

এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের একটা জনতাত্ত্বিক বৃত্তান্ত পেশ করতে চেয়েছি। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য সংখ্যাগত বা তুলনাত্মক বিশ্লেষণ করা নয়। এখানে লক্ষ্যটা হচ্ছে সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের এক নজরে দেখা। এটা তৈরি করতে আমরা অংশগ্রহণকারীদের করা জাতি, লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধকতা, বার্ষিক আয়, জেলা, পেশা, জন্মগত পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক, আর বাসস্থান নিয়ে দেওয়া উত্তরগুলো বোঝার চেষ্টা করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি খুব অগোছালো ছিল। কিছু জটিলতার গল্প আমরা নীচে করেছি ।

জেলা

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা হুগলি, উত্তর চব্বিশ পরগনা, মালদা, দার্জিলিং, কলকাতা জেলার বাসিন্দা। এই ম্যাপে আমরা জেলাপ্রতি অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা দেখাতে চাইছি।



চিত্র - জেলার হিসেব

বয়স

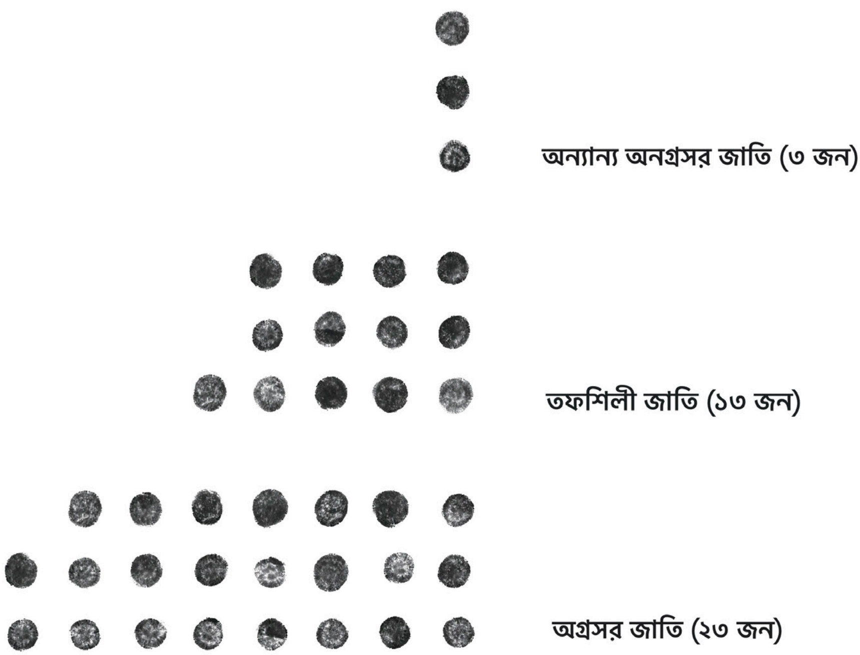
আমরা অংশগ্রহণকারীদের বয়স লিখে নিয়ে তাদের বয়সের পরিসর খুঁজতে চেয়েছি।

বয়স	কতজন একই বয়সের	মোট কতজন		
১৯	১	১		
২০	৩	৪		
২২	১	৫		অংশগ্রহণকারীদের এক-চতুর্থাংশ
২৩	২	৭		
২৪	২	৯	ছয় বছরের পরিসর	
২৫	১	১০		
২৬	৩	১৩		
২৭	২	১৫		অংশগ্রহণকারীদের এক-চতুর্থাংশ
২৮	৩	১৮	চার বছরের পরিসর	
২৯	২	২০		
৩০	১	২১		
৩৩	১	২২		
৩৪	২	২৪		অংশগ্রহণকারীদের এক-চতুর্থাংশ
৩৫	১	২৫		
৩৬	৩	২৮		
৩৮	১	২৯	দশ বছরের পরিসর	
৩৯	১	৩০		
৪০	৩	৩৩		
৪২	১	৩৪		
৪৪	১	৩৫		অংশগ্রহণকারীদের এক-চতুর্থাংশ
৪৫	২	৩৭		
৪৬	১	৩৮	সাত বছরের পরিসর	
৪৭	১	৩৯		

চিত্র - গবেষণায় অংশগ্রহনকারীদের বয়সবিন্যাস

জাতি

বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের ক্যাস্ট বলতে অসুবিধা হচ্ছিল। প্রায়শই আমাদের এটাকে জাতি বা বর্ণ বলে বললে, জাতির নামের তালিকা শোনালে, বা ওদের এস.সি বা এস.টি সার্টিফিকেট আছে কিনা জানতে চাইলে অংশগ্রহণকারীদের বুঝতে সুবিধা হচ্ছিল। অনেকেই প্রথমে নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা একে অপরের প্রশ্নোত্তর বুঝতে পেরেছি। কয়েকজন অংশগ্রহণকারী নিজের ক্যাস্ট বা জাতি হিসেবে রাজবংশী, মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ, হালদার, বিহারী শর্মা, বাঙালি ইত্যাদিও বলেছে। একজন বলেছে, “বায়োলজিক্যালি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছি।”



চিত্র - গবেষণায় অংশগ্রহনকারীদের জাতিপরিচয়

কোনও অংশগ্রহণকারীই ক্যাস্টের নজর থেকে তাদের স্ট্রাগলের কথা বলেনি। আমাদের সাক্ষাৎকারও ক্যাস্টের কথা মাথায় রেখে গঠন করা হয়নি। কিন্তু এটাতো আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে জাতিবাদ সমস্ত অবদমনের মূলে। এই জাতিবাদের

কারনেই রূপান্তরকামী মানুষদের উপার্জনের জায়গাটা এতটা সংকুচিত। এই কারনেই অনেকবার আমাদের নিজেদের উপর হয়ে চলা শোষণের সাথে মানিয়ে চলতে হয়। আমাদের গবেষণায় কোন আদিবাসী ট্রান্স মানুষ নেই। এটাও আমাদেরই একটা ত্রুটি। আমাদের গবেষণায় জাতিবাদের কোন বিশ্লেষণ নেই, সেটাও আমাদের একটা কমতি।

লিঙ্গ

কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর নিজের লিঙ্গ পরিচয় দিতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। অনেকেই এই প্রশ্নের উত্তরটা প্রাথমিকভাবে ইংরেজিতে দিয়েছিল। যেটার জন্যও হয়তো তাদের অসুবিধা হচ্ছিল। অংশগ্রহণকারীরা তাদের যা যা লিঙ্গ পরিচয় দিয়েছিল, তার একটা তালিকা আমরা নিচে প্রকাশ করলাম। কতজন একই পরিচয়ের সাথে সহমত ছিল সেই সংখ্যাটা পাশে লেখা আছে।

ব্যবহৃত লিঙ্গপরিচয়	সংখ্যা
ট্রান্সজেন্ডার	১৪
ট্রান্সওম্যান	০৫
কোতি	০৭
গে	০২
মেয়ে	০১
ট্রান্সম্যান	০৪
ম্যানলি কোতি	০১
কোতি (হিজড়ে)	০১
মহিলা, ট্রান্সজেন্ডার	০১

চিত্র - গবেষণায় অংশগ্রহনকারীদের ব্যবহৃত লিঙ্গপরিচয়

প্রতিবন্ধকতা

আমাদের গবেষণায় অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে চারজনের প্রতিবন্ধকতা আছে। দুইজনের মৃগীরোগ আছে, একজনের একটা কিডনি, আরেকজন এক চোখে অন্ধ। এদের জন্য শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে কোন সঙ্কুলান না থাকায় সবাইকেই প্রচুর বাধার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। এদের সবার গল্পই এই বইতে আছে।

বাসস্থান

আমাদের ঊনচল্লিশ জন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে, ঊনত্রিশ জন বা প্রায় চুয়াত্তর শতাংশ জানিয়েছে তারা তাদের জন্মগত পরিবারের সাথে থাকে। যদিও সবার জন্মগত পরিবারের সাথে সম্পর্ক আলাদা আলাদা রকমের। কেউ কেউ নিজেদের জন্মগত পরিবারের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, আর অনেকেই এই গ্রহনযোগ্যতাটা পেতেও চায়। আবার অনেকে এটাও বিশ্বাস করে যে জন্মগত পরিবারের প্রতি তাদের আর্থিক সহায়তাই তাদের গ্রহণযোগ্যতার কারন।

অর্থনৈতিক অবস্থান ও কর্মসংস্থান

আমাদের সব অংশগ্রহণকারীই অসংগঠিত কর্মজীবী। অনেকেই মরশুমি পেশায় নিয়োজিত। যেমন ধার্মিক অনুষ্ঠানে অভিনয়। সেই জন্য তাদের মাসিক উপার্জন স্থায়ী নয়। অংশগ্রহণকারীদের বলা তাদের মাসিক ও মরশুমি উপার্জনের পরিমানের উপর ভিত্তি করে আমরা তাদের বার্ষিক আয় অনুমান করেছি। আমরা তাদের বার্ষিক আয়ের ভিত্তিতে তিনটা ক্রমবিন্যাস পেয়েছি। এক লাখের নীচে, এক থেকে তিন লাখের মধ্যে, এবং তিন লাখের উপরে। যেসব অংশগ্রহণকারীদের মাসিক উপার্জন একটা পরিসরের মধ্যে ছিল, সেই পরিসরের ঠিক মধ্যবর্তী অঙ্ক নিয়ে আমরা তাদের বার্ষিক আয় অনুমান করলাম। যেটা আমরা পরবর্তী ছবিতে দেখালাম।

অনেক অংশগ্রহণকারীই দিনে ছয় থেকে আট ঘন্টা কাজ করে। কয়েকজন দিনে বারো ঘন্টাও কাজ করে। কিন্তু বহু অংশগ্রহণকারীই কলঙ্কিত অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রে যুক্ত। যেমন ভিক্ষা বা যৌনপেশা বা বার ড্যান্সার। এই কলঙ্ক যুক্তিহীন, তবুও এর ফলস্বরূপ এই সমস্ত পেশায় লিপ্ত অংশগ্রহণকারীদের নানা হয়রানি, শোষণমূলক বেতনব্যবস্থা, আর কর্মক্ষেত্রে অসুরক্ষার সঙ্গে জুঝতে হয়।

কিছু কিছু সমস্যাগুলির সম্মুখীনতো লিঙ্গনির্বিশেষে সমস্ত অসংগঠিত কর্মজীবীকেই হতে হয়। এর সাথে অনেক অংশগ্রহণকারীই জানিয়েছে তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বিদ্বেষের শিকার হয়েছে। যেমন মৌখিক, শারীরিক, বা যৌন হয়রানি এবং অত্যাচার। সে কারণে অনেককেই সেই কাজ ছেড়ে আরো অসুরক্ষিত পেশাগুলোয় ঢুকতে হচ্ছে। সমাজের মূলস্রোতের কাজগুলিতে থাকতে রূপান্তরকামী মানুষদের কাছে এটাই সবচেয়ে বড় বাধা, চেষ্টার অভাব বা দক্ষতার অভাব নয়। অনেক অংশগ্রহণকারীকেই শোষণমূলক কর্মব্যবস্থা, হয়রানি, বা অত্যাচারের জেরে তাদের মূলস্রোতের কাজটা হারাতে হয়েছে। পরবর্তী ছবিতে আমরা অংশগ্রহণকারীদের করা পূর্ববর্তী এবং বর্তমান পেশার একটা শব্দ গুচ্ছ তৈরি করেছি। এই শব্দ গুচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের গবেষনায় অংশগ্রহণকারীরা কত ভিন্ন ভিন্ন পেশাতে শ্রমদান করছেন।



চিত্র - গবেষণায় অংশগ্রহনকারীদের পেশাসমূহ

আয়ের উপরে তো জীবনের বাকি সবকিছুই নির্ভর করে । যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানসিক সুস্থ্যতা, ঘরসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষা, এবং সামাজিক অবস্থান। যে মানুষদের বার্ষিক আয় এক লাখের নীচে (ঊনচল্লিশ জনের মধ্যে পনের জন, বা অংশগ্রহণকারীদের

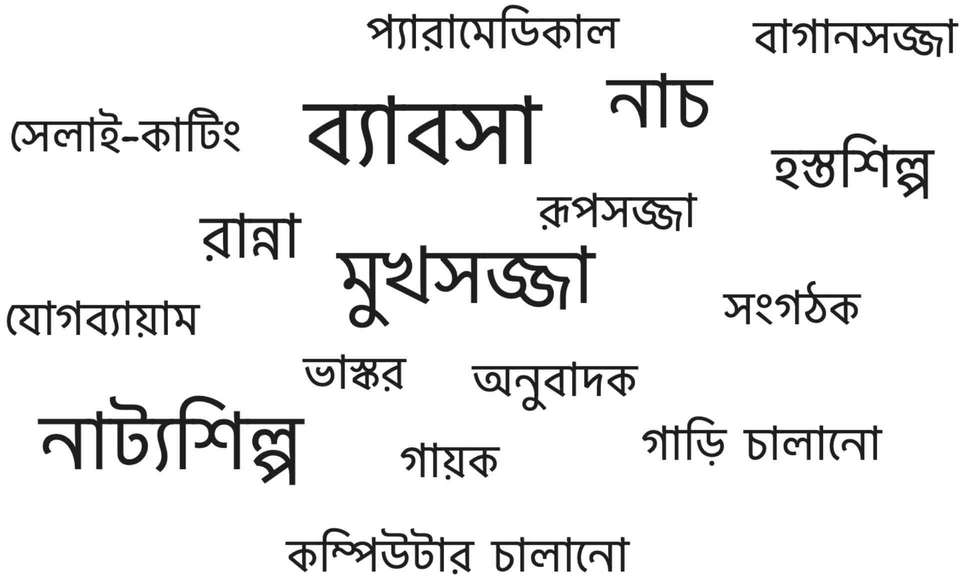
সাড়ে আটত্রিশ শতাংশ) তারা ওষুধের খরচ কীভাবে বহন করতে পারে? তাদের দিনের খরচ তুলতে পারছে না। বহু অংশগ্রহণকারীদের কোন স্বাস্থ্যবীমা নেই। সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থার পরিষেবা যথেষ্ট নয়, আর বহু রূপান্তরকামী মানুষকেই বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার কোন পরিকাঠামোও নেই। বহু অংশগ্রহণকারী, বিশেষ করে যারা যৌনপেশায়, যাত্রাপালায়, মুখসজ্জায়, বার বা জাগরণ ড্যান্সের পেশায় আছে তারা জানিয়েছে যে তাদের পেশাগত ব্যবহারের কিছু জিনিস, যেমন মেক আপ, পোশাক-আশাক, বা গয়নাগাটি কিনতেই একটা মোটা অঙ্কের টাকা বেরিয়ে যায়। বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীদের কোন সঞ্চয়ই নেই। যদিও কয়েকজন উপার্জন বাড়লে সঞ্চয় করার ইচ্ছে রাখে। পঁয়ত্রিশ বয়সের ঊর্ধ্বের রূপান্তরকামী মানুষদের জন্যে সঞ্চয়ের পথটা এখনও একটা ধোঁয়াশা। কারণ বয়স বাড়লে যৌনপেশা বা বার ড্যান্সারের পেশাটা আর ধরে রাখা যায় না।

দক্ষতা

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের ধ্রুপদী নৃত্য, লোক নৃত্য, টিউশনি, যোগব্যায়াম, ব্যবসা পরিচালনা, মুখসজ্জা, রান্না, গৃহস্থালির কাজ, ভাস্কর্য, কমিউনিটির উদ্যোক্তা ইত্যাদি তে দক্ষতা আছে। আমরা এই দক্ষতাকে জীবিকার উৎস হিসেবে দেখতে চাইনা, যদিও এই দুটো বিষয় একে অপরের সাথে সংযুক্ত। দক্ষতা বলতে আমরা বোঝাচ্ছি

পরবর্তী পাতায় দেওয়া শব্দগুচ্ছে আমরা দেখিয়েছি আমাদের অংশগ্রহণকারীদের বলা তাদের দক্ষতা।

আমাদেরকে নিজেদের দক্ষতা পরিবেশনে বাধা দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী অধ্যায়ের গল্পগুলিতে আমরা দেখব প্রত্যেকের ক্ষমতায়নের পথে কত কত সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধা অতিক্রম করতে হচ্ছে। তাদের পরিবার বা কমিউনিটিও তাদের ক্ষমতায়ন বা তাদের দক্ষতার বিকাশ নিয়ে উৎসুক নয়। রূপান্তরকামী শিশুদের বিকাশে পরিবার এবং কমিউনিটি দুদলই বিনিয়োগে অনাগ্রহী। অনেক ক্ষেত্রেই তারা সামাজিক গ্লানির শিকার। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুঁজির অভাব তাদের বহু সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। একরকম বাধ্য হয়েই তাদের ভিক্ষা, যৌনপেশা, চটুল নাচ, বাধাই এর কাজে আসতে হয়। আমাদের ক্ষমতায়নের জন্য রূপান্তরকামী মানুষদের সমাজে কবি, চিত্রকার, লেখক, স্রষ্টা, সংগঠক, নৃত্যশিল্পী, প্রবলেম সল্ভার, এবং ম্যানেজার হিসেবে মান্যতা পাওয়া জরুরি। কোন অদূর ভবিষ্যতে নয়, অবিলম্বে জরুরি।



চিত্র - গবেষণায় অংশগ্রহনকারীদের বিভিন্ন দক্ষতার বিষয়

দুঃখের শেষে সুখের হাসি

অজয় একজন ট্রান্সম্যান, যে থাকে খড়দা, উত্তর চব্বিশ পরগনায়। অজয়ের বয়স চৌঁত্রিশ এবং অজয়ের একজন পার্টনার আছে যার বয়স তেত্রিশ বছর। ওদের নিজেদের মধ্যে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে তাই দিয়ে একে অপরের রেসপন্সিবিলিটি টা পূরণ করে।অজয় অগ্রসর শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত। অজয় তার দিদাকে নিয়ে থাকে, এবং তার দিদার বয়স আঠাত্তর, এবং দিদাকে দেখার আর কেউ নেই।

অজয় খুব ছোটবেলায় অনাথ। প্রথম প্রথম সে তার দাদু-দিদার কাছেই ছিল, কিন্তু তার খাওয়া-পরা ও শিক্ষার খরচ দিতে ওর দাদুর খুব অসুবিধা হত। তাই ক্লাস থ্রি তে পড়ার সময় দাদু অজয়কে তার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। তার মামা-মামীর অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল, অজয়কে তারা স্কুলে ভর্তি করে এবং একটি প্রাইভেট টিউশনেও দেয়। কিন্তু, অজয়কে দিয়ে তারা ঘরের সব কাজও করাত। প্রতিদিনের ঘর মোছা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ও রান্নাবান্না শেষ করার পরই অজয় পড়ার সময় পেত। ঘরের কোনকাজ মনমত না হলে অজয়ের মামা তাকে খুব মারত।

অজয় কৈশোরে পদার্পণ করার পর তার মামা তার উপর নানারকম শারীরিক ও যৌন অত্যাচার শুরু করে। অজয় যখন ক্লাস সিক্সে পড়ত, তখন সে এই অত্যাচার আর নিতে পারছিল না। একদিন যখন তার দাদু দেখা করতে আসে তখন অজয় দাদুর কাছে ফেরত গিয়ে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অজয় একবেলা খাবার খেতেও রাজী ছিল যতক্ষণ না তাকে তার মামাদের কাছে থাকতে হত। তারপর তার দাদু তাকে ফেরত নিয়ে চলে আসে।

অজয়ের দাদু সাইকেল করে বাজারে চাউমিন বিক্রি করত। তাঁর পক্ষে এই ছোট আয়ে অজয়ের দেখাশোনা করা খুবই কঠিন ছিল। এত কিছুর মধ্যেও অজয় নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অজয়ও পয়সার অভাবে বাধ্য হয় স্কুল ছেড়ে কাজে ঢুকতে। দাদুর মৃত্যুর পর এখন অজয় তার দিদার দেখাশোনা করে।

কোভিডের আগে অজয় একটি গার্মেন্টস এর দোকানে কাজ করতো, গার্মেন্টসের কাজ অজয়ের আগাগোড়াই পছন্দের। তার কারণ গার্মেন্টস এর কাজ করতে গিয়েই ও নিজের একটা স্বাধীনতা খুঁজে পায়। অজয় এক জায়গার মধ্যে কাজ করতে চায় না, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাজ করার মধ্যে যে স্বাচ্ছন্দ্যটা আছে সেটা অজয়ের খুব পছন্দের। এই গার্মেন্টসের কাজ করার মধ্যেই অজয় তার দিদার দেখাশোনা করে। অজয় নিজের সার্জারিটাও এই গার্মেন্টস এর কাজ করতে করতেই করিয়েছিল। সার্জারি করতে অজয়ের প্রায় আড়াই লাখ টাকা খরচ হয় এবং তার মধ্যেই প্যান্ডেমিক চলে আসে।

কোভিড সিচুয়েশনের পর অজয়ের চাকরিটাও চলে যায়। অজয়ের কাছে মাথা গোজার ঠাঁই থাকলেও খাবে কি, সেই চিন্তাটা তাকে বারবার ভাবাতে থাকে। এই কাজ করে সে

মোটামুটি ভালোই একটা ইনকাম করতো। মাসে প্রায় পনেরো থেকে পঁচিশ হাজার টাকার মতো আয় হত। কাজটা চলে যাওয়ার পর সেই ইনকামটাও বন্ধ হয়ে যায়। যখন টাকা ছিল না তখন তাকে ছাতু মেপে খেতে হতো। যদি দিদিমাকে দিতো তাহলে সে এক বেলা নিজে না খেয়ে থাকতো। আরেক বেলা খেলে দিদিমাকে কী করে খাওয়াবে সেটা ভেবে অজয় অনেক কষ্ট করে দিন কাটিয়েছে।

কোভিডের পর অজয় আরেকটা দোকানে চাকরি পায়, কিন্তু সেখানে অজয় যা মাইনে পায় সেটা যথেষ্ট নয়। ঘর চালাতে অজয়ের মাসে প্রায় পনের হাজার টাকা লাগে। তার পরেও তিন হাজার টাকা প্রায় ওষুধ খরচাতে চলে যায়, যার দু হাজার টাকা ইনজেকশন নিতে যায় এবং প্রায় এক হাজার টাকা তার হরমোনের ওষুধ কিনতে খরচ হয়। অজয়ের আরো কিছু সার্জারি করার ইচ্ছা রয়েছে। এই সার্জারিটার খরচ প্রায় পাঁচ লাখ টাকার মত কিন্তু এখন সে সেভিংসটা সেভাবে করতে পারছে না। আগে যে কাজটা করে সে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে আয় করতে পারতো, সেখান থেকে সে যেটুকু জমাতে পেরেছিল, সেই টাকাটা দিয়ে তার একটা সার্জারি হয়েছে। তাতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এই নতুন সার্জারিটা, যাতে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা খরচ হবে, অজয় জানেনা তার পক্ষে সেটা কীভাবে সম্ভব হবে। কীভাবে সে এই টাকাটা জমাতে পারবে, যাতে আগামী দিনে সে সুস্থভাবে বাঁচতে পারে এবং নিজের সার্জারি করাতে পারে।

অজয় তার স্বাধীনতা বা ক্ষমতা বলতে বোঝে তার জেন্ডার, সেখান থেকে তার নাম এবং সেটা যাতে খুব রেস্পেক্ট এর সাথে ব্যবহার করা হবে। স্কুল শেষ করতে না পারা নিয়ে অজয়ের কোনো অনুশোচনা নেই, বরং সে মনে করে লোকজন তাকে তার কাজের কোয়ালিটি দিয়ে চিনুক। কিন্তু শুধুমাত্র ট্রান্সম্যান হওয়ার কারনে তাকে বিভিন্ন জায়গায় কাজে নেওয়া হয় না।

অজয়ের যেহেতু কোন মা-বাবা নেই, ছোটবেলা থেকেই সে অনাথ এবং দিদার কাছে মানুষ হয়েছে। তাই সে দুস্থ বাচ্চারা এবং কমিউনিটির যে সমস্ত ভাইয়েরা আছে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে চায়। অজয়ের সর্বাঙ্গীণ এই বিষয়টা তার নিজের জীবনের চলার পথে প্রত্যেকটা সময় তাকে আন্দোলনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অজয় খুব কষ্ট করে নিজেকে আজকের তারিখ পর্যন্ত এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। নিজে বিভিন্ন রকম লড়াই করেছে। নিজের আত্মমর্যতার জন্য তার লড়াই। সে আন্দোলন করছে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার, সুস্থ রাখার, এবং তার সাথে দিদিমাও যাতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকে ও তার পার্টনার যাতে তার সাথে বেঁচে থাকে, সেটাই ও প্রত্যেকটা মুহূর্তে চেষ্টা করে যাচ্ছে। অজয় চায় যাতে আমরা আমাদের কমিউনিটির মানুষরা সুস্থভাবে বেঁচে থাকি, যে কাজটা আমরা করি তা যাতে আমরা সুষ্ঠভাবে করতে পারি।

বেরঙ্গীন গোলাপ

মালার বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনার বরানগরে। মালা নিজেকে একজন ট্রান্সওম্যান বলতে পছন্দ করে। মালা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। মালা ফরওয়ার্ড ক্যাস্ট। মালার বাড়িতে মা বাবা ও দিদিরা আছে এবং এরা সবাই খুব সাপোর্টিভ। এরা মালা কে খুব ভালোবাসে এবং খুব সাপোর্ট করে। মালার এক ভাগ্নে আছে, সেও মালাকে খুব সাপোর্ট করে। মালা চায় তার সমস্ত কিছু তার ভাগ্নের নামে করে দিয়ে যেতে।

মালা রান্নার কাজ করে। সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে দুপুর আড়াইটার পর্যন্ত তাকে এই কাজটা করতে হয়। রান্নার কাজ করতে তার খুব ভালো লাগে। রান্নার কাজে ওর একটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে। রান্নার কাজ করে ও খুব আনন্দ পায়। মালা রান্না করে লোককে খাওয়াতে খুব পছন্দ করে। রান্না খেয়ে যদি কেউ ওর প্রশংসা করে সেটা ওর খুব ভালো লাগে।

মালার এখন প্রায় পাঁচ হাজার টাকার মতো ইনকাম আছে মাসে। মালার বাবাও পেনশন পান। তাই মালার খুব একটা অসুবিধা নেই ফ্যামিলিতে। তার কারণ মালার বাবা ফ্যামিলিটা টেনে নেন, কিন্তু মালার খুব ভালো লাগে গ্যাসের বিলটা দিতে, বা ইলেকট্রিকের বিলটা দিতে। পরিবারের জন্য কিছু করতে পারলে মালার খুব ভালো লাগে। বাড়িতে টাকা পয়সা দিতে পারে বলে তার খুব গর্ববোধ হয়।

কোভিডের সময় মালার অনেক অসুবিধা হয়েছিল। মালা যে কাজটা করছিল, সেই বাড়িতে কোভিডের সময় থেকেই মালার যদি একটু কাশি বা হাঁচি হয় তাহলে সেই বাড়ির লোকরা ভাবে এই বুঝি তাদের কোভিড হয়ে গেল। সেই বাড়িতে তাই মালাকে অনেক দূর দূর করা হয়। মালার এটা খুব কষ্ট লাগে যে এখন তো কোভিড নেই, তার পরেও তাকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। ঠান্ডা লাগলে বা সর্দি কাশি হলে হাঁচতে কাশতে পারেনা।

কোভিডের সময়েই মালার গায়ে একবার গরম ভাতের ফ্যান পড়ে গা পুড়ে গেছিল। কিন্তু যে বাড়িতে এই ঘটনাটি ঘটেছিল, সেই বাড়ির লোকেরা মালাকে কোন সাহায্য করেনি, কোন খোঁজ খবর নেয়নি। মালা চিকিৎসার জন্য নিজেই প্রায় আট থেকে দশ হাজার টাকা খরচ করেছিল। এসব ঘটনা সত্ত্বেও মালার এই রান্নার কর্ম জীবনটা খুব ভালো লাগে। নিজেকে এই কাজে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

মালার নিজস্ব একটি ফ্ল্যাট আছে এবং সেই ফ্ল্যাটটি আপাতত বন্ধক দেওয়া আছে। পরিবার গত কারণে এই ফ্ল্যাটটি তাকে তার ভাগ্নের জন্য বন্ধক রাখতে হয়েছিল এবং ভাগ্নেই এখন সেই ফ্ল্যাটের পেমেন্টগুলো করছে। মালা বর্তমানে তার ভাগ্নেকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করছে যাতে ভবিষ্যতে ভাগ্নেই তাকে দেখে। মালা এতটাও শিওর নয় যে ভবিষ্যতে ভাগ্নে তাকে কতটা কী দেখবে, কিন্তু ও খুব আশাবাদী কারণ ওর ব্যাংকে নমিনি থেকে শুরু করে সবকিছুই ওর ভাগ্নের নামে। মালার একটা ব্যাংক একাউন্ট আছে

যেখানে ওর প্রায় ছয় হাজার টাকা মত জমা আছে। মালা এর বেশি কিছু সেভিংস করতে পারেনি। মালা নিজের জন্য খুব একটা খরচ করে না। শুধু নিজের কিছু জামা কাপড় বা এক্সট্রা কোন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতেই খরচ করে।

মালা চায় ভবিষ্যতে নিজের বাড়ি থেকেই শাড়ি পড়ে বেরোতে। বাড়ি থেকে শাড়ি পড়ে বেরোনোটা মালার কাছে একটা অধিকার বলে মনে হয়। মালা চায় আমাদের মত যে সমস্ত মানুষ আছে তাদের পাশে দাঁড়াতে। এটাই মালার কাছে ক্ষমতা।

দিশাহারা পথিক

সুনিতা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী একজন ট্রান্সওম্যান। সুনিতার বাড়ি হুগলির শ্রীরামপুরে। কিন্তু ও বর্তমানে থাকে দমদমে। সুনিতা নিজেকে একজন ট্রান্সওম্যান বলে। ও ফরওয়ার্ড ক্যাস্ট। সুনিতার বাড়িতে বাবা-মা-ভাই-ভাইয়ের বউ আছে এবং এরা খুবই সাপোর্টিভ।

সুনীতা একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। সুনিতা বাই প্রফেশন ভিক্ষাবৃত্তি করে। ও ট্রেনে ভিক্ষা করে। এই প্রফেশনে সে প্রায় দশ থেকে বারোহাজার টাকা মাসে আয় করে। তার দুটি পরিবার। একটি জন্মগত পরিবার যারা শ্রীরামপুরে থাকে, সেখানে ও মাসে প্রায় ছয় হাজার টাকা করে দেয়। আর তার নিজের পরিবার দমদমে, যেখানে মাসে প্রায় ওর পাঁচ হাজার টাকা মত খরচ হয়। সুনিতার নিজের কোন পার্টনার নেই। সুনিতার একটি গোল্ড লোন আছে এবং সেই গোল্ড লোন সুনীতাকে মাসে মাসে শোধ করতে হয়।

সুনিতা আমাদের আরো বলে যে ও যে পেশাটা করছে তাতে এক সময় একটা স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও বর্তমান সময়ে সেটা আর নেই। যারা ভিক্ষা করে তাদের এখন অনেক ভয়ে ভয়ে কাজ করতে হয়। সরকার নানা রকম ভাবে বাধার সৃষ্টি করে। মাসে ওরা এখন পনেরোদিন মত কাজ করতে পারে।সরকার একে তো কাজ দেয় না, তার পর, দু-পাঁচ টাকা যে ভিক্ষে করে আয় করে, তাতেও তাদের আপত্তি। ওদের নামে নানারকম মিথ্যা আরোপ রটানো হয়। সুনীতা চায় যে সরকার যেন যখন তখন হ্যারাস করতে না পারে।

লকডাউনের আগে সুনিতা সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে একটা অফিসে কাজ করছিল। সেখানে বাকিদের মাইনে দেওয়া হলেও, সুনিতা ট্রান্স বলে তাকে মাইনে দেওয়া হতো না। তার ফলে সুনীতাকে বাধ্য হয়ে ছল্লা পেশায় আসতে হয়েছে। সুনিতা এই পেশায় এসেছে লকডাউনের পর, কারণ পেট তো চালাতেই হবে, বেঁচে তো থাকতেই হবে, পরিবার তো চালাতেই হবে।

লকডাউনের পরে সুনিতাকে বিভিন্ন রকম গ্রুপ ও এনজিওর কাছ থেকে সাহায্য নিতে হয়েছে। যখন বিভিন্ন সময় ট্রেনগুলো ক্যান্সেল করা ছিল তখন তার দিন চলত না। তখন সে নানা রকম ভাবে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বিভিন্ন রকমের ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে গেছে। কিভাবে বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট পেতে পারে তার খোঁজ করতে হয়েছে। তারপর সুনিতা আবার ভিক্ষা করা শুরু করে। এখন ও শুধু পনেরো দিনই ট্রেনে কাজ করতে পারে।

সুনীতা মনে করে এসআরএস করালে ওর মনে শান্তি আসবে। এসআরএস করাতে ওর আড়াই থেকে তিন লাখ টাকা মত খরচা হবে। তার কাছে সেই টাকাটা জোগাড় করার সামর্থটাই নেই এবং সেটা জোগাড় করাও অনেক কঠিন। সুনিতা মনে করে যে এসআরএস করালে ওর ক্ষমতা অনেক বেশি বাড়বে। এসআরএস করালে লোক তাকে

অনেক রেসপেক্ট করবে। এটা সুনিতার কাছে একটা বড় ক্ষমতার জায়গা বলেই মনে হয়েছে।

সুনিতা এখনো ভয়ে ভয়ে থাকে যে সার্জারি হয়নি বলে লোকজন তাকে ফেক ট্রান্স বলতে পারে বা মারধর করতে পারে বা নানা রকম অত্যাচার করতে পারে। অনেক সময় ওর পুলিশের ভয় করে যে পুলিশ জিজ্ঞাসা করতে পারে ও কেন এসআরএস করায়নি। সুনীতার বন্ধু-বান্ধবরা এবং ওর বাড়ি থেকেও সার্জারি করাতে চাপ দিচ্ছে।

সুনিতা ভিক্ষাবৃত্তির সাথে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও সে কখনো এই পেশার একজন নায়ক বা লিডার হতে চায়না। কারণ সুনিতা মনে করে এরকম লিডার হলে সে নিজে অনেকটা বদলে যাবে। সুনিতা একজন সাধারন মানুষের মতো বাঁচতে চায় এবং তার পেশাটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সুনিতা মনে করে এই পেশার সাথে যে লড়াই গুলো যুক্ত আছে, তারা ভিক্ষা করে খায় বলে যে সমস্ত অপ্রেশন আছে, সুনিতা সেগুলোকে সমাজ থেকে শেষ করতে চায়। সুনিতা চায় সরকার যেন তাদের এই পেশাটার একটা স্বীকৃতি দিক। যাতে পুলিশ তাদেরকে যখন তখন কোনভাবে হ্যারাসমেন্ট করতে না পারে। সুনিতা চায় আগামী দিনে সে যাতে এই পেশাটা সুস্থ ভাবে, স্বাচ্ছন্দ্য ভাবে করতে পারে, এই পেশার সাথে যাতে যুক্ত থাকতে পারে, এবং মাথা উঁচু করে যাতে এই পেশাটা সে করতে পারে। সুনীতা বলেছে যে তার মত একজন মধ্যবয়স্ক রূপান্তরকামী মানুষের চাকরি বা প্রশিক্ষণের জন্য সমাজে সুযোগ বা সমর্থন নেই। তাহলে তারা কোথায় যাবে? কীভাবে বাঁচবে? সুনীতা মনে করে এটা তার ন্যায্য অধিকার। এটা তার একটা চাওয়ার বোধ এবং চাওয়ার জায়গা।

সুনীতা জিজ্ঞেস করেছে যে *“ভারতের সংবিধান যদি ভিক্ষাবৃত্তিকে বেআইনি না বলে, তাহলে আমাদের এত হেনস্থা কেন করা হয়?”*

বিনা পাল্কির বউ

এই গল্পটি প্রশান্তের। প্রশান্ত নিজেকে কোতি হিসেবে পরিচয় দেয়। ওর বয়স ৪২ বছর। ও জেনারেল কাস্ট হিন্দু এবং ওর বাড়ি বনহুগলিতে। ওর পরিবারে মা এবং দাদা বাড়িতে থাকে। ওর দাদার তিন মেয়ে, বৌদি নেই। প্রশান্ত ক্লাস সিক্স অবদি পড়াশোনা করেছে।

প্রশান্ত লোকের বাড়িতে ডোমেস্টিক ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করে। সে মাসে প্রায় এক হাজার টাকা মতো ইনকাম করে। তার কাজের টাইম দুটো থেকে ছয়টা, প্রায় চার ঘন্টা কাজ করে। তার মৃগী রোগ আছে, সেই জন্য সে ভারী কিছু কাজ করতে পারে না। সে বেশি সকালে উঠতে পারে না। যদি সে কোনদিন সকাল ছটায় উঠে যায় তাহলে সকাল আটটার মধ্যে তার একটা অ্যাটাক আসে। সেজন্য বাড়ির লোকও তাকে বেশি কোন প্রেসার দেয় না। প্রশান্ত মাঝে মাঝে নিজের খরচা চালানোর জন্য যৌনপেশাও করে। এই কাজটা ও বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বা হাই রোডে গিয়ে পয়সা নিয়ে করে। কিন্তু যদি কোন সুন্দর হ্যান্ডসাম ছেলে পায় তাহলে ফ্রিতেও করে।

বাড়িতে ও প্রায় পাঁচশ টাকা করে দেয়। দাদা ওর পয়সা নিতে চায়না, তবুও ও দাদার হাতে পাঁচশ টাকা দেয় যেহেতু ও বাড়িতেই থাকে এবং খায়। ওর যে পয়সাটা বাঁচে সেটা দিয়ে ও নিজের জন্য জামা কাপড় কেনে।

আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে কোভিডটা ওর কিভাবে কেটেছে। তখন ও বলেছে যে কোভিডের আগে ও ওর এক বান্ধবীর বাড়িতে কাজ করত, সেখানে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে হাজার টাকা মতো পেত। আর চার-পাঁচ বছর আগে সে দুটো বাড়িতে কাজ করতো। একটা বাড়িতে দুহাজার টাকা পেত এবং আরেকটা বাড়িতে পাঁচশ টাকা পেত। এখন যে বাড়িতে সে কাজ করে সেখানেই তাকে খেতে দেয়। কিন্তু কোভিডের সময় ও বাড়ি থেকে বেরোতে পারতো না। কোভিডের পরেও সে অনেকটা সময় কোন বাড়িতে কাজও পাচ্ছিল না। আপাতত কোভিডের পর একটা বাড়িতে কাজ করে। সেখানে ওকে খেতেও দেয়। কিন্তু এই কাজ করে ও যেটুকু টাকা পায়, সেটা দিয়ে তার সবকিছু হয় না।

প্রশান্তর ভালো লাগে যে ও মেয়েদের মতো সাজবে। ওর একটা ভালো স্বামী হবে। ওর এসআরএস করানোর ইচ্ছা আছে। ও আরো বলল যে এসআরএস করাতে অনেক খরচা, আনুমানিক প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে এক লাখ টাকা মতো খরচ হয়।

ভবিষ্যতের জন্য কোন সেভিংস আছে কিনা জানতে চাইলে প্রশান্ত জানাল যে ওর সেভিংস বলতে প্রায় কিছুই নেই। ভবিষ্যৎটা ওর কাছে একটা খুব বড় চিন্তার বিষয়। ও বলল, *“এখন আমরা একটা ভাড়া বাড়িতে থাকে। আমার দাদার বয়স হচ্ছে। দাদার মেয়েরা ওকে দেখবে। কিন্তু আমাকে কে দেখবে? আমার টাকা পয়সা নেই। আমার পাশে কেউ নেই। এর থেকে ভগবান যদি আমাকে তুলে নেয় তাহলেই খুব ভালো হয়।”*

প্রশান্তের জানাশোনা আরো অন্যান্য ট্রান্স ও অ্যাক্টিভিস্ট লোকজন ওকে অনেক সাহায্য করে। ওকে রেশন দেয়। তাতে ওর কিছুটা জীবন যাপন হয়। ও বলল ওর ফোনের এখন কোন কভার নেই, ফোনে রিচার্জ নেই। এখনও স্যালারি পায়নি।

প্রশান্ত বলছিল যে ওর কাছে যদি টাকা হত, তাহলে ও সেক্স চেঞ্জ করত, ও একটা ভাল পার্টনার রাখত, টাকা দিয়েই রাখত। শাঁখা সিঁদুর পরত, মেয়েদের মতো সেজেগুজে থাকত, খুব আনন্দে থাকত।

আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেউ সাপোর্ট করে কিনা, ও বলল যে ছোটবেলায় ও দিদিদের জামা কাপড় পরত, তখন ওর দাদা-মা-বাবা এরা বকাবকি করত। ওর সাজতে খুব ভালো লাগে। ওর মেয়ে বন্ধুরা ওকে অনেক সাপোর্ট করেছে। ও বলেছে যে ভগবান যদি ওকে নারী করে জন্ম দিতো, তাহলে ওর আজকে বিয়ে হয়ে যেত।

আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি যে, ওর কী ক্ষমতা? ও ক্ষমতা বলতে কী বোঝে? বা ক্ষমতার মানে ওর কাছে কী? তখন ও বলেছে যে, ও বোঝে না ক্ষমতাটা কী। ও বলেছে, *"যে সরকার ভালো কাজ করে, সবাইকে টাকা পয়সা দেয়, কিন্তু আমাদের মত মানুষদেরকে দেয় না।"*

কালো গোলাপের মিলনমেলা

পুনীতা আর মুকুল দুজনে খুব ভালো বন্ধু। তারা আমাদের কাছে একসাথে এসেছিল এবং আমরা তাদের সাক্ষাৎকারটা একসাথে করেছিলাম। এদের মধ্যে একজন নিজেকে রাজবংশী বলেছে, এবং অন্যজন ফরোয়ার্ড ক্যাস্ট।

মুকুল আর পুনীতা শিলিগুড়িতে থাকে। কোভিডের সময় এরা পড়াশোনা করত। পুনীতা মেকাপের কাজও করত, তখন তাদেরকে বাড়িতে পয়সা দিতে হত না। দুশ টাকা ইনকাম করলেই সেটা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কোভিডের পর থেকে তাদের নিজেদের পরিবারকে দেখতে হচ্ছে। ফ্যামিলিকে দেখতে হচ্ছে। লকডাউন ওঠার পরে তাদের ইনকামের কথা ভাবতে হয়। তখনই তারা যৌনপেশা শুরু করে।

কোভিডের আগে এরা এনজিও সেক্টরে যখন বিভিন্ন এইচআইভি ইন্টারভেনশন প্রজেক্ট চলতো তখন সেই সমস্ত জায়গায় এরা কাজ করেছে। এবং সেখানে তারা অনেক কমিউনিটির লোকজন, বিশেষত সিনিয়র ট্রান্স লোকজন যারা আসত, তাদের সাথে এরা কথা বলত। এই এনজিওগুলোতে অনেক হিজড়া ঘরানোর মানুষজনও আসত। তারাও এদেরকে অনেক সাপোর্ট করেছে। তখন এনজিওগুলোতে কাউন্সেলিং এর একটা ব্যবস্থা ছিল। এইচআইভি ইন্টারভেনশনের সিস্টেম ছিল। তো সেখানে আগে ফ্যামিলির কাউন্সিলিং করত এবং তার মা-বাবা রা এখন এই অ্যাকসেপ্টেন্স টা দিয়েছে। এখন বিভিন্ন এনজিও বন্ধ আছে।

আমাদের সাথে কথা বলার সময় ওরা জানায় যে সেক্স ওয়ার্ক করতে গেলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের রিস্ক নিতে হয়। পুলিশ বা কাস্টমাররা বিভিন্ন রকম ভাবে হ্যারাস করে। বিভিন্ন ক্লায়েন্ট বিভিন্ন রকমের জোর-জবরদস্তি করতে পারে। অনেক সময় ক্লায়েন্টরা বিনা প্রোটেকশনে সেক্স করার জন্য জোর-জবরদস্তি করে। সেই জন্য এই লোকাল সেক্স ওয়ার্কার কমিউনিটিতে যে ট্রান্স মহিলারা রয়েছে তারা নিজেদের মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যে সমস্ত ট্রান্স মহিলাদের খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড আছে বা নিজেদের গ্রুপে বন্ডিংটা ভালো সেরকম তারা দুজন তিনজন করে প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টের সঙ্গে যাবে। তাতে প্রোটেকশন বেশি থাকে। এরা কাস্টমার কে আগে থেকে বলে দেয় যে সার্ভিসটা নেবে তার পয়সাটা সবার মধ্যেই সমান ভাগে ভাগ হয়ে যাবে।

এরা এখন খুবই ভয় পাচ্ছে যে এখন আর আগের মত সুরক্ষিত জায়গা কিছু নেই। সমস্ত সুরক্ষিত জায়গা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সেই জন্য অনেক সময় রাতে যদি কোন হোটেল না পাওয়া যায় তাহলে এরা কাস্টমারকে বিভিন্ন রকম ভাবে মোটিভেশন দেওয়ার চেষ্টা করে। যাতে কাস্টমার তাড়াতাড়ি কোন কাজ করে পেমেন্ট দিয়ে চলে যায়, পুরো রাত যাতে থাকতে না হয়। এবং ওরা এই ভাবেই আপাতত কাজটা করে আসছে।

এরা বিভিন্ন বার থেকে কাস্টমার নেয়। এই সমস্ত বারের একটা স্ট্রিক্ট নিয়ম আছে যে

এদের ক্লায়েন্টদেরকে আগে অনেকটা টাকা খরচা করাতে হবে। কাস্টমারদের দিয়ে বারে টাকা খরচা করিয়ে তারপর এরা তাদের ক্লায়েন্টদের অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। এরা একেক জন কাস্টমারদের থেকে নাইটে সার্ভিসের বিনিময়ে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা নেয়।

যদি কাস্টমারদের হোটেল থাকে তাহলে পাঁচ হাজার টাকা নেয়। যদি কাস্টমারদের জানাশোনা হোটেল না থাকে তাহলে এরা নিজেদের চেনাশোনা একটা হোটেলে কাস্টমারকে নিয়ে যায় এবং সেই হোটেলের খরচা বাবদ ভাড়া বাবদ ওরা এক্সট্রা দুই হাজার টাকা কাস্টমারদের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। এরা কাস্টমারদের কে আগে থেকেই বলে রাখে যে ওরা শীমেল বা ট্রান্স এবং সেটা শুনে কাস্টমাররা রাজি হলেই তখনই তাদের সাথে যায়।

একটা কথা ওরা আমাদেরকে বারবার করে দুজনেই বলেছে যে ওদের নিজেদেরকে ভীষণ সুন্দর করে, স্টাইলিশ করে, অনেক প্রমিনেন্ট করে নিজেদেরকে প্রেজেন্ট করতে হয়, তাহলেই কাস্টমাররা বেশি আসে। ওরা এটাও আরো বলেছে যে কমিউনিটির অনেক মানুষ আছে যারা বারে গিয়ে তালি মারে বা প্রচুর মদ খেয়ে গন্ডগোল করে একটা সিন ক্রিয়েট করে। এবং এর ফলে ওই দু চারজনে জন্য পুরো কমিউনিটিকে ওই রকম বারগুলো থেকে ব্যান করে দেওয়া হচ্ছে। সেই জন্য ওরা নিজেদের জায়গায় নিজের মতো করে খুব স্ট্রিক্টলি এই রুলগুলোকে ফলো করে। এবং বারের যা নর্মস বা সিকিউরিটি প্রোটোকল আছে সেটা মেন্টেন করেই কাজ করে, সেটা ফলো করেই কাস্টমার নেয়।

এরা এটাও বলেছে যে কাস্টমারদের কাছে এখন ক্যাশ টাকা প্রায় থাকেই না। ম্যাক্সিমাম কাস্টমাররাই অনলাইন পেমেন্ট করা প্রেফার করে, তাই এখন ওরা এটাও চেষ্টা করে যে আগে থেকে পেমেন্ট টা নিয়ে নিতে। কারণ অনলাইন হওয়ার জন্য অনেক সময় কাজ হওয়ার পরে কাস্টমার আর টাকা দিতে চায় না। তাছাড়াও বিভিন্ন সময়ে এই লাইনে বিভিন্ন রকম ঝামেলা হতে পারে, সেই জন্য আগে থেকে আগে থেকে টাকা নিয়ে নেওয়াটা অনেক সেফ এদের জন্য।

পুনীতা আর মুকুল এইচআইভি ইনফেকশনের ব্যাপারে খুবই সচেতন। এরা নিয়মিত এইচআইভি টেস্ট করায়। বর্তমান সময়ে এইচআইভি এবং হেপাটাইটিস প্রচুর বাড়ছেও। এই সময় ওদের মধ্যে হঠাৎ করে কেউ যদি কোন ভাবে ইনফেক্ট হয় তাহলে তাকে কে দেখবে? এরা সেই জন্য নতুন যে প্রজন্ম যারা নতুন যৌনকর্মের পেশাতে আসছে তাদেরকেও এরা এই বিষয়ে জানাচ্ছে। ওদেরকে ওরা বারবার করে বলছে যে ওরা যাতে নিজেদের মতো করে রক্ত পরীক্ষা করায় রেগুলারলি।

এরা আমাদের বলেছে যে এদের রুজি রোজগারের জায়গাটায় তারা যে ইনকামটা করছে সেটা এখন তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। ওদেরকে এখন বাড়িতে প্রত্যেক মাসে প্রায় তের থেকে চৌদ্দ হাজার টাকা দিতে হয়। যৌনকর্ম এখন ভালো হচ্ছে না এবং এরা এই কাজটা করে আনন্দও পাচ্ছে না। এরা আরো বলেছে যে ইয়াং জেনারেশনের ছেলেদের থেকে অনেক রিস্ক থাকে। কিন্তু সিনিয়র সিটিজেন কিংবা কোন ফ্যামিলি থেকে আসা পুরুষ কাস্টমাররা এদেরকে অনেক বেশি সাপোর্ট করে এবং বেশি টাকা দেয়। ওদের অনেকেই ইমোশনাল সাপোর্ট খুঁজতে এদের কাছে আসে। ওরা এটাও আমাদের কাছে বলেছে যে অনেক কাস্টমার কিন্তু বাইরে হয়তো আত্মপ্রকাশ করতে পারে না যে সে একজন বাই সেক্সুয়াল কিংবা তারা গে বা শীমেল-লাভার কিন্তু তারা এদের কাছে নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারে।

এরা দুজনেই খুব ভালো মেকআপ করে। এবং এরা খুবই ভালো মেকআপ আর্টিস্ট। মেকাপের কাজের বিভিন্ন কোয়ালিটি আছে এবং এরা খুব হাই কোয়ালিটি মেন্টেন করে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মেকাপের কাজ এরা সাধারণত নিজস্ব বন্ধু-সার্কেল, আত্মীয়-স্বজন এবং ফেসবুক থেকে বুক করে। এই মেকআপের কাজে কোয়ালিটি মেনটেন করার জন্য এদের অনেক দামি দামি মেকাপ প্রোডাক্ট কিনতে হয়। যেমন এক একটা লিপস্টিক এর দাম প্রায় আটশ থেকে সতেরশ টাকার মতন।

ওদের মধ্যে পুনীতার কিন্তু বিয়ে হয়ে গেছে। পুনীতা বলেছে যে ও হয়তো আরও দু-তিন বছর এই পেশাতে থাকবে, যেহেতু ওর স্বামী আছে। স্বামী জানলেও শ্বশুর-শাশুড়ি জানে না যে ও সেক্স ওয়ার্ক করে। শাশুড়ি জানে যে ও নার্স বা আয়ার কাজ করে। ওর শাশুড়ি এটাও জানে যে ও একজন ট্রান্স মহিলা। ওর স্বামী ওর শাশুড়িকে বুঝিয়েছে।

অন্যজন, মুকুল, চায় যে সে একটা দোকান খুলবে। এবং সেই দোকানটা যদি ওর বাবা যদি ওকে করে দেয় তাহলে সে লিপস্টিক-শ্যাম্পু-কসমেটিক্সের একটা সুন্দর দোকান খুলে বসতে পারে। সে রাতে এই যৌন পেশার সাথে যুক্ত থাকতে চায়, আর দিনে দোকান চালাতে চায়। পুনীতা চায় যে সে একটা মেকআপ স্টুডিও খুলবে, সেখানে সে মানুষদেরকে প্রশিক্ষণ দেবে। বর্তমানে সে এরকমই একটা স্টুডিও খোলার চেষ্টার কথা প্রকাশ করেছে।

আমরা যখন ওদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ক্ষমতায়ন বলতে কি বোঝ, তখন ওরা জানায় যে ওরা ক্ষমতায়নের মানে বলতে বোঝে আমরা নিজেরাই একাই একশ এবং আমাদের লড়াইটা আমাদেরকেই লড়তে হবে। আমাদের পাশে সবাইকে পেতে হবে। এটাই তাদের ক্ষমতায়ন।

পুনীতা আর মুকুলের গল্পগুলো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে

যৌনকর্মীদের সমাজে প্রফেশনাল হিসেবে স্বীকৃতি না থাকা সত্ত্বেও এরা নিজেদের কাজে প্রতিফলনশীল পেশাদারিত্বটা বজায় রেখেছে। এরা নিজেদের এবং কাস্টমারদের নিরাপদ রাখার জন্য বিভিন্ন পরিকাঠামো ও অভ্যাস তৈরি করেছে। এবং এর মাধ্যমে এরা আমাদের চোখে লিঙ্গবৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাত রঙা জীবন

রচনা আর মধু দুই বন্ধু যারা একসাথে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এসছিল। দুজনেই শিলিগুড়িতে থাকে। দুজনেই স্ট্রিট বেস্‌ড সেক্স ওয়ার্কার। দুজনেই তফশিলী জাতির তালিকাভুক্ত।

রচনা চায় যে সে কোন একটা ছোট কাজই করবে। এর আগেও সে অনেক কাজেই অ্যাপ্লাই করেছে। গভর্নমেন্ট জব এর জন্য, চা বাগানে কাজের জন্য, বিভিন্ন হসপিটালে কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে, কিন্তু কোন জায়গা থেকেই কোন রেসপন্স আসেনি।

রচনা আগে এইচআইভি ইন্টারভেনশন প্রজেক্ট এ কাজ করত। সেখানে সে লোকজনকে টেস্টিং করাতে নিয়ে যেত। তার সাথে সাথে সে ফিল্ড ভিজিট, ডাটা কালেকশন, পিআর ডায়রি ফিল ইত্যাদি করত। কিন্তু এগুলো যেহেতু টার্গেটেড ইন্টারভেনশন প্রজেক্ট, এখানে ছয় মাস অন্তর অন্তর স্যালারি হয়। ওকে যে যাতায়াত করতে হতো তার যাতায়াতের খরচটা সে পেত না। এই কারণে ওর আর্থিক প্রবলেম হচ্ছিল। ওর স্কুটির জন্য ইএমআই ভরতে পারছিল না। স্কুটি ছাড়া তো যাওয়া আসা সম্ভব নয়। ওকে কলেজে যেতেই প্রায় ৩০ কিলোমিটার আপ ডাউন করতে হত। সেই জন্য সে ওখানে কাজ ছেড়ে বাধ্য হয়েছিল। তার পরে ও সেক্স ওয়ার্ক করতে শুরু করে।

রচনা এর আগে একটা রিসেপশনের কাজে চাকরি পেয়েছিল। সেখানে ওর বারো ঘন্টা ডিউটি ছিল। ওকে খুব সকালেএ যেতে হত শাড়ি-চুড়ি-লিপস্টিক পরে। কিন্তু সেই বারো ঘন্টা ওকে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হত আর সেটাও মাত্র দিনে ছয়শ টাকার কাজ। তাই সে এই কাজটাও আর করতে চায়নি। তারপরে ওর আরো একটা অপশন এসেছিল; একটা এনজিওতে পিয়ার কাউন্সেলিং করানোর জন্য একটা অফার এসেছিল। রচনা ইন্টারভিউ দিয়েছিল, সিলেক্টও হয়েছিল, কিন্তু এই কাজটাও করতে পারেনি কারণ এখানেও সেই ছয় মাস অন্তর অন্তর মাইনে। কিন্তু এখানে মাইনেটা বেশি ছিল।

আমাদের সঙ্গে আরেকজন যে আছে, সে মধু। মধুর বয়স অনেক কম এবং বাড়িতে ও ওর মায়ের সঙ্গে থাকে। মধু ছোট একটা বইয়ের দোকানে কাজ করত। সেখানে ওকে বিভিন্ন রকম ভাবে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। দোকানে যারা কর্মচারী ছিল তারাই ওকে বিভিন্নভাবে যৌন নির্যাতন করত, মারধরও করত। তারপর সে ওই দোকানের কাজ ছেড়ে দেয় এবং বেরিয়ে আসে।

লকডাউনের পর রচনা আর পড়াশোনা করতে পারেনি। ওর মাস্টার্স করার ইচ্ছা ছিল। আর মধু ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে।

রচনা প্রথমে একাই স্ট্রীট বেস্‌ড সেক্স ওয়ার্ক শুরু করে, তারপরে ও মধুকে সঙ্গে নেয়। মধু আর রচনা খুব ভালো বন্ধু। ওরা দুজনে মিলে একসঙ্গে কাজ করে। প্রথম

প্রথম রচনা আর মধু লকডাউনের সময় দুইশ থেকে তিনশ টাকা রেটে কাজ করা শুরু করে। তারপর ওরা যখন দেখল যে কাস্টমাররা ওদের কাছে আসছে, তখন তারা রেটটা আস্তে আস্তে বাড়ালো। পাঁচশ থেকে ছয়শ টাকা করল। তখন ওরা সাত থেকে আট জনের একটা গ্রুপ মিলে এই কাজগুলো করত। কিন্তু আস্তে আস্তে ওদের গ্রুপে নানা রকমের সমস্যা শুরু হতে লাগলো।

কখনো কখনো কাস্টমারদের জিনিসপত্র চুরি ছিনতাই হয়ে গেল। কাস্টমাররা বিভিন্নভাবে হেনস্থা হতে লাগল, তখন কিন্তু কাস্টমাররা আস্তে আস্তে ভেঙে গেল। রচনা বললো ওর একজন কাস্টমার ছিল যে পাঁচশ টাকা করে দিত, খুবই রেগুলার কাস্টমার। কিন্তু ওদের গ্রুপের অন্যান্য কয়েকজন ওর থেকে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা ছিনতাই করে নিয়েছিল, তারপর সেই কাস্টমারও ভেঙে যায়।

তার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও অনেক হিংসার শিকার হতে থাকে। রচনার যখন ফোন হারিয়ে গিয়েছিল তখন পুলিশের কাছে রচনা ওর বয়ফ্রেন্ড কে নিয়ে এফআইআর করাতে গেছিল, তখন কিন্তু পুলিশ ওর কেস নেয়নি, বরং বিভিন্ন রকম উল্টোপাল্টা কথা বলে বের করে দিয়েছিল। ওদেরকে নানারকম নোংরা কথাবার্তা বলে উত্ত্যক্তও করেছিল।

রচনা বারবার বলছিল যে আমরা নিজেদেরকে মেয়ে হিসেবে থানায় যদি কোন ডায়েরি বা কেস করতে যাই পুলিশ কিন্তু তখন সেই কেস নেয় না, আমাদেরকে সিরিয়াসলি নেয় না। কিন্তু আমরা যদি হিজড়ে সেজে যাই, হাততালি মারি, চিল্লিয়ে কথা বলি, তাহলেই পুলিশ আমাদের কেসটা নেয়। ওর সাথে এরকম ঘটনা অনেকবার ঘটেছে, পুলিশ ওকে মেরেছে বা পুলিশ ওর কেস নেয় নি।

মধু যখন প্রথম কাজ করা শুরু করে তখন কিন্তু ও পয়সা নিতে পারত না। আরো রাস্তায় দাঁড়ালে কাস্টমারদের দেখে ভয় পেত। এখন ওর এই ভয়টা কেটে গেছে। আর ও এখন ন্যায্য পয়সাটা চাইতে পারে। মধু একটা গল্প বলল যে, ও একবার একটা কাস্টমারের কাছে গেছিল, সেখানে বেশ কয়েকজন চলে আসে, এবং সেই কাস্টমাররা ওর ফোন ছিনতাই করে নিয়েছিল। ওকে পাথর দিয়ে মেরেছিল। রচনার কাছে যখন খবর যায়, রচনা তখন মধুকে হসপিটালে নিয়ে যায়। কিন্তু ওরা যৌন পেশার কাপড় পরেছিল বলে ডাক্তাররা ওদেরকে ছুঁতে চায় নি, এবং অন্যদেরকেও ছুঁতে দেয় নি।

রচনাকে একবার এক কাস্টমার কাজের জন্য অনেকটা দূরে অন্ধকার জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। সেই অন্ধকার রাস্তা থেকে রচনা কোনভাবেই বাড়ি ফিরতে পারছিল না, সেজন্য সে ওখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে লিফট নেওয়ার চেষ্টা করছিল এবং বিভিন্ন লোকের কাছে লিফট চাইছিল। সেরকম একজন তাকে ছেড়ে দেওয়ার নাম করে একটা বড় মাঠের মাঝখানে একটা গাছ তলায় নিয়ে যায় এবং ফোন করে তার আরেক বন্ধুকে

ডেকে নেয়। সেই বন্ধুর কাছে একটা ছুরি ছিল। তারপরে ওরা রচনার সঙ্গে জোর জবরদস্তি করে সেক্স করে। ওরা এটাও দাবি করে যে ওরা রচনাকে পাঁচশ টাকা পেমেন্ট করেছে, যদিও রচনা কোন পয়সাই পায়নি। কিন্তু রচনা এটাও বলেছে যে, সবাই তো আর খারাপ হয় না, সেই রাতে আরেকটা ছেলে ছিল, যে তাকে ভালো করে রচনার বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেছিল অত রাতে।

ওরা যখন লকডাউনের সময় সেক্স ওয়ার্ক শুরু করেছিল, রচনা তখন অনেক কষ্ট করে বাড়ি থেকে শাড়ি-চুড়ি পরে বেরচ্ছিল। তখন ওর বাবা ওকে বলেছিল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু ওর মা ওকে আটকে রেখেছিল। তখন ওর বাড়িতে একটা কারফিউ ছিল যে ওকে সন্ধে সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু ওর বাবা-মা যখন দেখল যে মেয়ে উপার্জন করে এনে দিচ্ছে, তখন সেই ব্যারিয়ারগুলো আস্তে আস্তে উঠে যায়।

রচনার এখন একটি ছেলের সাথে ভালোবাসা আছে। ওরা দুজন কোর্টে লিগাল ম্যারেজের জন্য চেষ্টাও করেছিল, উকিল বিয়ের জন্য দশহাজার টাকা চেয়েছিল। কিন্তু পরে উকিল তাদের বলেছে এরকম কোন কেস এখন হচ্ছে না, তাই বিয়েটা করানো যাবে না। রচনা সার্জারি করিয়েছে। সার্জারির খরচ, হোটেল আর ট্রাভেলের খরচ নিয়ে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মত খরচ হয়। ওর বাড়ি থেকেই এটার জন্য প্রিপেয়ার করেছিল। রচনার বাড়ির লোক ওকে বলেছিল যে ও যেন হিজড়া পেশায় না যায়, এবং এই শর্তের বিনিময়ে ওর বাড়ির লোক ওকে এই সার্জারিটা করিয়ে দিয়েছে।

আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ওকে বাড়িতে কত টাকা খরচা দিতে হয়। রচনার যেহেতু ওর বয়ফ্রেন্ডের সাথে মা-বাবার বাড়িতেই থাকে সেই জন্য ওকে আর ওর বয়ফ্রেন্ডকে মাসে পাঁচ-পাঁচ করে মোট দশহাজার টাকা দিতে হয়। তার সাথে ইলেকট্রিসিটি, গ্যাসের বিল, এসব মিলিয়ে মাসে গড়ে প্রায় পনের হাজার টাকা ওরা বাড়িতে দেয়। মধুর ফ্যামিলিতে যেহেতু শুধু মধু আর মধুর মা থাকেন, সেহেতু মধুকেই পুরো সংসারটাই বহন করতে হয়। সেটাও মাসে প্রায় দশ হাজার টাকার মতো হয় বলেই মধু বলেছিল।

রচনা চায় ও নিজের মতো করে একটা দোকান খুলবে। ও খুব ভালো থাই ফুড আর মোমো রান্না করতে পারে। ওর বাড়িটা যে চত্বরে সেখানে একটা হসপিটাল আছে, ওখানে অনেক দোকানও আছে। কিন্তু অন্য দোকানদাররা রচনা কে ওখানে দোকান খুলতে দেয় না, ও ট্রান্স বলে। ওর সঙ্গে অনেক রকম বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়। রচনা মেকআপ এর কাজ করবে বলে প্রায় চার লাখ টাকার প্রোডাক্ট কিনেছিল কিন্তু ঠিকমতো ইউটিলাইজ করতে পারেনি। মধু চায় একটা ভাল কাজ করতে বা ভালো একটা চাকরি করতে। তার সাথে পারলে ওরা সেক্স ওয়ার্কটাকেও কন্টিনিউ করবে।

রচনা আর মধু বিভিন্ন ভায়োলেন্স ফেস করার পরেও, বিভিন্ন সামাজিক অস্বীকৃতির

মধ্যে থেকেও নিজেদের জীবন-যাপন ও আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যৌন পরিষেবা দেওয়ার সাথে সাথেই এরা ক্রমাগত কাজ খুঁজছে, ব্যাবসা শুরু করার চেষ্টা করছে। নিজেদের অধিকার এরা জানে। এরা একে অপরের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, এবং সেটা করতে করতেই যৌনকর্মীদের সুরক্ষার তাগিদে নিজস্ব পরিকাঠামো গঠন করছে। সমাজের প্রতিটা স্তরে, কাস্টমার থেকে শুরু কর, পুলিশ, চাকরিদাতা, এমনকি পরিবারও যৌনকর্মীদের জীবনের মূল্য ও অধিকার মুছে ফেলতে চাইছে। যৌনকর্মীদের উপর হয়ে চলা এই অত্যাচার আর সমাজে, ঘরে, কর্মক্ষেত্রে, রাস্তায় ঘটে চলা নারী বিদ্বেষী হিংসার সাথে জড়িত। এদের গল্পে আমরা স্পষ্ট ভাবে দেখতে পেয়েছি কীভাবে সরকারী কন্ট্রাক্টের কাজের বেতনব্যবস্থা থেকে শুরু করে, অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষার অভাব, এবং যৌনকর্মীদের জন্য শারীরিক, আর্থিক, আইনি ও চিকিৎসাগত নিরাপত্তার অভাব পর্যন্ত এক পরিকাঠামো গত সমস্যা, যা এদের জীবনকে আরো দুর্বিষহ করে তোলে।

স্নেহের চাদর

আমাদের এই গল্পের নায়িকা ববিতা দাস। ববিতা মালদা শহরে নিজের চেলা, নাতি-চেলা এবং পরিবারকে নিয়ে থাকে।

ববিতার ভাই তাকে পরিবারের কোনো সম্পত্তি পেতে দেয়নি। তারপরেও সে নিজের মত করে লড়াই করেছে, বিভিন্ন সময়ে নিজেকে যে ইনকাম করে চালাতে হবে, নিজের একটা জায়গা করে নিতে হবে, সেই খানে তিনি একটি সাফল্য পেয়েছে।

ববিতা মনসা পালার নামভূমিকায় অভিনয় করে। পালাপ্রতি কাজ করে ববিতা দিনে আটশ থেকে নয়শ টাকা করে পায় এবং কাজটা রাত্রি নটা থেকে বারোটা পর্যন্ত তিন ঘন্টার কাজ।

ববিতা পনের বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে বিহার চলে যায় লণ্ডা ড্যান্স করতে। বিহারে সে প্রায় ছাব্বিশ বছর কাটায়। যখন ও বিহার থেকে ফিরে আসে তখন ও ওর হিজড়া গুরুর হাত ধরে ছল্লা পেশায় ঢোকে। ও মালদা ও ফরাক্কা স্টেশনের মধ্যে দিয়ে যে দূরগামী ট্রেনগুলি যায়, সেগুলোতে ভিক্ষা করে।

এই ছল্লা পেশার মাধ্যমে কাজের জায়গায় বিভিন্ন সময়ে ববিতাকে বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। টোন টিটকিরি খেতে হয়েছে। অনেক সময় অনেকে ফোন নাম্বার চেয়েছে। ববিতা বলেছে যে ও খুব ভদ্রভাবে এই পেশাটা করে। ও বারবার বলেছে যে এই পেশাটা ও ভালোবেসে, আনন্দ করে করে। তার কারণ এই কাজটা না করলে ওর পেটে ভাত আসবে না। ববিতা ওর প্রচুর চ্যালা ও নাতি-চ্যালাদের এই ভিক্ষাবৃত্তিতে ঢুকিয়ে আয়ের সংস্থান করে দিয়েছে। তা নিয়েও ববিতার অনেক গর্ব আছে।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে এক রেলস্টশনে ববিতার একজন দশ-এগার বছর বয়সী ছেলের সাথে দেখা হয়। সেই ছেলেটি ববিতার পিছু পিছু তার বাড়ি আসে এবং থেকেও যায়। ববিতা ছেলেটিকে নিজের সন্তানের মতই মানুষ করেছে। ছেলের এখন চৌঁত্রিশ বছর বয়স এবং ববিতা তার বিয়ে দিয়েছে। আমরা তখন দেখেছিলাম যে ওর একটা ক্ষমতায়ন হয়েছে, একটা আত্মমর্যাদার জায়গা তৈরি হয়েছে। ওর ছেলের যখন বিয়ে দেওয়া হয়, তখন কিন্তু ও ট্রান্স বলে কোন রকম ডিসক্রিমিনেশন করা হয়নি। বরঞ্চ ছেলের শ্বশুর বাড়ির লোক ওকে ভরসা ও বিশ্বাস করেই ওর ছেলের সাথে তাদের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। ছেলে এখন বাইরে অন্য রাজ্যে কাজ করে। ববিতার নাতি-নাতনি আছে এবং তাদের সঙ্গে ববিতা অনেক সময় কাটায়।

ববিতা বিভিন্ন সময় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন ক্ষমতা পেয়েছে। ববিতাকে যখন জিজ্ঞাসা করি যে কোভিড কিভাবে কেটেছে তখন ও বলে যে খুবই ভয়ংকর একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। ববিতা ওর চেলা ও নাতি-চ্যালা দের নিয়ে

প্রায় দশ-বারো জন একসাথে ছিল। ববিতা একটা ঘরে থাকত। তখন ট্রেন,যাত্রাপালা সবই বন্ধ ছিল। কোন আয়ের জায়গা ছিল না। বিভিন্ন এনজিও থেকে তখন কোভিডের সময় যা রেশন পেয়েছে সেটা নিয়েই ববিতা তার চ্যালাদের ও নাতি-চ্যালাদের খাইয়েছে এবং নিজে খেয়েছে। ওর পরিবারে যে বাচ্চাকাচ্চা আছে তাদেরকেও ববিতাই বড় করেছে।

একটা শিক্ষা আমরা ওর কাছ থেকে পেলাম যে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা কী করে ঠিক রাখতে হয়। ওর যে চ্যালা বা নাতি-চ্যালারা রয়েছে তাদেরকে কিন্তু ববিতা বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছে অর্থনৈতিক দিক থেকে কীভাবে স্থিতিশীল হতে হবে, কীভাবে নিজের অর্থনৈতিক জায়গাটা তৈরি করতে হবে, পরিবার-পরিজনকে টাকা দেওয়ার পরেও নিজের সেভিংস কীভাবে করতে হবে। ববিতা বলেছে যে নিজের এই সেভিংস্টা নিজেকে অনেক সম্মানীয় করে তোলে এবং ভবিষ্যতে বয়সকালে এটা নিজের কাজেও লাগে। ববিতা নিজের সমস্ত চ্যালা এবং নাতি-চ্যালাকে বারবার এই শিক্ষাটা দিয়ে এসেছে। এর সাথে ওর একটা কষ্টের জায়গা যে অনেক চ্যালারা বা নাতি-চ্যালারা ওর কথা শোনে না। কোনরকমই সেভিংস করে না। বিভিন্ন বাজে খরচ করে টাকা উড়িয়ে দেয়। পরিবারের পেছনে সব টাকা খরচা করে দেয়। এটা ববিতার একটা অভিযোগ। ওদের কথা ভেবে ববিতার কষ্ট লাগে।

ববিতার কিছুটা জমি আছে আর কিছুটা টাকা-পয়সা আছে কিন্তু এই যে ছোট সঞ্চয়টা আছে সেটা দিয়ে ববিতা বাকি জীবন বসে খেতে পারবে না। ভবিষ্যতে ওর ইচ্ছা আছে যদি একটা দোকান খুলতে পারে। যাতে বয়সকালে সেখানে বসে ববিতা ইনকাম করতে পারে।

ববিতা ভিক্ষা পেশায় বিভিন্ন সময়ে হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছে পুলিশের কাছ থেকে। একবার পুলিশ ওকে থানায় নিয়ে গেছিল এই অভিযোগে যে ববিতা পাবলিক জায়গায় গণ্ডগোল করছে। ববিতা থানায় আত্মপক্ষ সমর্থনে সফল হয়েছিল, এবং সেইজন্য পুলিশের মধ্যেও ববিতার একটা সম্মান আছে। মাঝেমাঝে অন্য কোতিদের সাথে ঝামেলা মিটমাট করতে পুলিশ ববিতার সাহায্য চায়। ববিতা আরও জানাল যে পুলিশ কিন্তু যে সমস্ত হিজড়া-কোতিরা ট্রেনে ভিক্ষা করে, তাদের নামে একটা ফলস কেস দেয়। সেই কেসটা কীসের, সেটা কিন্তু ববিতা আদৌ জানে না। কিন্তু ট্রেনে কাজ করতে হলে হিজড়া-কোতিদের এই জুলুমটা সহ্য করতে হয়।

ববিতা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আন্দোলন করেছে, সমাজের সাথে আন্দোলন করেই নিজের জায়গাটা তৈরি করেছে। ববিতা নিজের বয়স কালে সবাইকে নিয়ে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে চেষ্টা করে। ববিতা নিজের সমস্ত চ্যালা, নাতি-চ্যালাদের অর্থনৈতিক সামর্থের একটা জায়গা তৈরি করে নেওয়ার কথা বলে, জীবনে দাঁড়ানোর জন্য, লাইফে

কিছু করার জন্য তাদেরকে অনেক উৎসাহ দেয়। আমরা যখন জানতে চাইলাম যে সমাজের কী পরিবর্তন ভবিষ্যতে ববিতা দেখতে চায়, তখন ও বলল, *"আমি চাই হিজড়া-কোতিরা জীবনে কিছু করে যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। আমরা কি শুধু ভিক্ষার পেশাতেই আটকে থাকব? সরকার আমাদের জন্য চাকরি দিক।"*

স্বপ্নের রানী

রাজের বয়স বাইশ বছর। ও মালদায় ওর মা-বাবা আর দুই বোনের সঙ্গে থাকে। ক্যাস্টের ব্যাপারে জানতে চাইতে রাজ জানিয়েছে যে ও হালদার জাতি। জেন্ডার সম্বন্ধে জানতে চাইলে বলেছে রাস্তায় পাবলিক হয়ত ওকে গে বলবে।

রাজ ছোটবেলা থেকে নিজেকে মেয়ে বলেই মনে করে এবং মেয়েদের মত করে সাজতে ভালোবাসে। চুল বড় রাখত বলে ওর পাড়ার লোকেরা বিভিন্ন রকম ভাবে টোন কাটত। ওর বাবা-মা ওকে ধরে মারধর করত। মা চুল কেটে দিতে বলত। কিন্তু এখন তারা এগুলো করে না। আর ওর ওই সব অত্যাচার সয়ে গেছে। যখন লকডাউন শুরু হয় তখন রাজ আর পড়াশোনা করেনি। লকডাউনের সময় পেটে খাবে না পড়াশোনা করবে, সেটা রাজের জন্য একটা বিশাল প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল। রাজের মা পরিচারিকার কাজ করে, কিন্তু রাজের বাবা'র চোখের সমস্যা থাকায় কোন কাজ পেতে অসুবিধা হয়।

রাজ তখন বিভিন্ন সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় রিল বানাত এবং এরকম করে আস্তে আস্তে ও মনসা গানের সাথে যুক্ত হয়। মনসা গান করে ও এখন একটা টাকাও পায়। প্রত্যেকটা স্লটে বা প্রত্যেকটা দিনে তিনশ টাকা থেকে চারশ টাকা করে ওর ইনকাম হয়। কিন্তু সেই আয়ের টাকা থেকেই ওকে মনসা গানের ড্রেস বানাতে হয়। সব টাকা সেখানেই চলে যায়।

রাজ লোকেদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেকাপের কাজ করে এবং ও ভবিষ্যতে একজন মেকআপ আর্টিস্ট হতে চায়। তার সাথে ওর খুব ভালো একটা প্রতিভা আছে। ও একজন মৃত্তিকা শিল্পী এবং ও খুব ভালো ঠাকুর বানায়। কিছু কিছু মূর্তি ও নিজের জন্য বানায় আর কিছু মূর্তি বানিয়ে ও পরিবারের লোকজন বা বন্ধু-বান্ধবদের উপহার দেয়। রাজ বর্তমানে দুটো বাড়িতে গৃহ পরিচারিকার হিসেবে কাজ করে। সেটার জন্য ও খুব খুশি।

রাজ কখনোই নিজের পরিবারকে ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতে চায় না। এটা রাজের ইচ্ছা এবং ও এটা ওর নিজের ক্ষমতায়ন বলে মনে করে। ও চায় ওর বাড়ি ওর আন্দোলনের একটা প্রেক্ষাপট এবং ভূমিকা হয়ে উঠুক। রাজের একজন বন্ধু আছে যার বাবা বন্ধু ট্রান্স বলে ওকে প্রচুর মারধর করত। সেই বন্ধুটি পালিয়ে বিহার চলে গেছিল। সেখান থেকে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে আসে। যখন ওর বন্ধুটি পালিয়ে গেছিল তখন ওই বন্ধুর বাবা রাজের নামে নানা রকম অ্যালিগেশন দেয় পুলিশের কাছে, যে রাজ ওই বন্ধুটিকে পালাতে সাহায্য করেছে। কিন্তু ওদের বন্ধুবান্ধবীরা পুলিশের কাছে গিয়ে ওর বাবা কি রকম অত্যাচার করে, সে খবরটা পুলিশকে দেয়। রাজ কে তখন পুলিশ ছেড়ে দেয়। রাজের একটা অদম্য জেদ আছে। ও ওর বন্ধুর মত পালিয়ে না গিয়ে নিজের পরিবারের সাথে থেকে ইনকাম করে নিজের জায়গাটা তৈরি করতে চায়। এটা রাজের মতে, তার একটা ক্ষমতায়নের জায়গা। রাজের ইচ্ছা আছে এসআরএস করানোর। ও বারবার বলেছে যে ও সার্জারি করাতে চায়, ও খুব সুন্দরী হতে চায়। এখানে তার একটা

ক্ষমতায়ন হবে বলেছে মনে করে। ও সার্জারি করিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা রূপ দিতে চায়, যাতে পাড়ার লোকরা যারা আগে টোন-টিটকারি কাটত, তারা যাতে এখন ওকে দেখে কথা বলার আগে ভয় পায়, দুবার ভাবে। এই স্বপ্নপূরন করতে রাজ বোম্বে গিয়ে তার বন্ধুর মত বার ড্যান্সার হতে চায়। এই কাজের টাকায় স্বপ্নপূরন করে রাজ কিন্তু আবার দেশে ফেরৎ এসে নিজের পরিবারের সাথে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়।

দুঃখের পাঁচিল

চন্দনা একজন রূপান্তরকামী নারী, যার বাড়ি মালদার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। ওরা তিন ভাই, তিন দিদি। চন্দনা বাড়ির সবচেয়ে ছোট। চন্দনার মৃগী রোগ আছে। এই জন্য ও ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। বাড়ি থেকে ওকে আর পড়ায়নি, কারণ যখন তখন ওর মৃগীর জন্য ভির্মি লাগত বলে কোথায় পড়ে থাকবে, কোথায় কি হবে, সে সব ভেবে ওকে আর স্কুলে পাঠানো হয়নি। ও ছোটবেলা থেকেই শাড়ি-চুড়ি পরতে ওর ভালো লাগত। কিন্তু এই শাড়ি পরার দরুন ওর দাদারা ছোটবেলায় ওকে খুব মারধর করত।

চন্দনার একবার ওখানকার মনসাপালার প্রোগ্রাম দেখে ওর নিজেরও যাত্রা পালা করার ইচ্ছা হয়। সেই প্রোগ্রাম ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করে ও তারপর যাত্রাপালা শুরু করে। যখন চন্দনা যাত্রায় নামে তখন ওর বয়স ছিল কুড়ি বছর। এখন বর্তমানে সেখানে প্রায় ও চারশ থেকে পাঁচশ টাকা দিনে পায়।

তারপরে ওর গুরুর সাথে আলাপ হয় এবং গুরুর হাত ধরে ও ছল্লা পেশায় আসে। ছল্লা ও মনসা পালার সাথে সাথে চন্দনা বিভিন্ন অর্কেস্ট্রায় লন্ডা ড্যান্সও শুরু করে। কিন্তু ওই কাজটা ওর ভালো লাগছিল না বলে সেই পেশাটা ছেড়ে দিয়ে ও বাড়ি চলে আসে তার পরে সে আবার ছল্লা পেশায় যোগদান করে। সেখানেও আবার ওর মন না লাগায় আরেকবার লন্ডা ড্যান্স করতে বিহারে চলে যায়। সেখানেই ও এসআরএস করায় কারণ ওর মনে হয়েছিল এসআরএস করিয়ে ও একজন সুন্দর নারীতে পরিণত হয়ে যাবে। এসআরএস করানোর পরেও ও বুঝতে পারছিল না যে ও কী কাজ করতে চায়। দিয়ে ও শেষমেশ দিল্লি চলে যায় ভিক্ষে করতে। দিল্লিতে ওর যে গুরু ছিল সে ওর উপর অনেক অত্যাচার করত, এমনকি ওর চোখে একবার লঙ্কাবাটাও ছুড়ে মারে। তারপর চন্দনা দিল্লি থেকে পালিয়ে আবার মালদা চলে আসে। মালদায় ওর যে গুরু আছে সে চন্দনাকে অনেক সাপোর্ট করে। এখানে ফিরে এসে চন্দনা আবার ভিক্ষা শুরু করে। তার সাথে সাথে ও মনসাপালাও করে।

কোভিডের সময় চন্দনাকে খুব কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তখন ট্রেন আর মনসা পালা, দুটোই বন্ধ ছিল। এক দাদা বলেছিল যে চন্দনা বাঁচুক বা মরুক, তাতে ওদের কিছু যায়-আসে না। কোভিডের সময় চন্দনা বিভিন্ন এনজিও আর অ্যাক্টিভিস্টদের কাছ থেকে সাপোর্ট পেয়েছে, এবং রেশন তুলে খেয়ে বেঁচেছে।

যখন কোভিড শুরু হয় তখন চন্দনার কাজও বন্ধ হয়ে যায়। কারন ট্রেন চলা বআর মনসা পালা, দুটোই বন্ধ হয়ে গেছিল। তখন ও ওর দাদাদেরর কাছে সাপোর্ট চেয়েছিল, যেটা ও পায়নি। ওর এক দাদা এরকমও বলেছিল যে চন্দনা বাঁচুক বা মরুক, সেটা ওর দেখার কোন দরকার নেই, এবং ও কোনোভাবেই চন্দনাদের কে সাহায্য করতে পারবে না। চন্দনা তখন বিভিন্ন এনজিও এবং লিডারের সাহায্য নিয়ে, ওদের কাছ থেকে রেশন পেয়ে সারভাইভ করেছে এবং নিজের সংসার চালিয়েছে।

এর বাইরেও চন্দনার সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হয়েছে। একদিন রাত্রে ও বাড়ি ফিরছিল এবং কিছু মাতাল ছেলেরা রাস্তায় ওকে ধরে এবং ওর কাছে টাকা পয়সা দাবি করে। চন্দনা সেই টাকা দিতে অস্বীকার করায় সেই ছেলেরা ওকে মারধর করে। ওর মাথায় ইট দিয়ে মারে। চন্দনা তখন অজ্ঞান হয়ে সেখানে পড়ে যায়। সেই রাস্তা দিয়ে পরে কিছু কমিউনিটির মানুষ তখন যাচ্ছিল, তারা চন্দনাকে রেসকিউ করে হাসপাতালে নিয়ে যায়, চন্দনাকে তারপর সেই হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ট্রান্সফার করা হয়।

চন্দনা এইসব লোকদের বিরুদ্ধে যে এফআইআর করেছিল, সেই এফআইআর এর ভিত্তিতে পুলিশ ওকে জানায় যে যারা চন্দনা কে অ্যাটাক করেছিল তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই জন্য নাকি কেসটা তুলে নিতে হবে। চন্দনা তখন বিশেষ কিছু জানত না বা বুঝত না আইন সম্পর্কে। সেই জন্য ও এফআইআরটা তুলেও নেয়। ও বলেছে যে ও একটু ভোলাভালা বলে লোকজন ওকে ইউজ করে চলে যায় এবং ওকে বারবার বিভিন্ন হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

চন্দনা আরো বলেছে ও যখন ট্রেনে কাজ করতে যায় তখন কিন্তু পুলিশ ওকে ওর নামে একটা কেস দেয়। সেই কেস বাবদ পুলিশকে ওকে পাঁচশ টাকা করে দিতে হয়। চন্দনা দিনে যেটুকুই কামাক না কেন, যদি প্রতিদিন পাঁচশ টাকা করে যদি তাকে পুলিশকেই দিতে হয় তাহলে যে টাকা তার বাঁচে, তাতে কোনোভাবেই তার দিন চলতে পারে না, আর সংসারও চলতে পারে না।

চন্দনার পাড়া-প্রতিবেশী চন্দনার উপর খুব অত্যাচার করে। ওদের দাবি যে চন্দনা ওই পাড়ায় থাকতে পারবেনা, ওকে বাড়ি বিক্রি করে ওখান থেকে চলে যেতে হবে। চন্দনা প্রথমে থানা পুলিশে যায়, পুলিশ তারপর ওকে বলে যে পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দনার পাড়ায় বারবার আসবে। তো পুলিশও ওকে ওই বাড়িটা বিক্রি করে দিতে বলে। তারপরে চন্দনার গুরু আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ায় যায় এবং পাড়ার বাকিদের সঙ্গে কথা বলে মিটমাট করার চেষ্টা করে। তারপরে এই ঝামেলাটা কয়েকদিন বন্ধ ছিল, কিন্তু তারপর ওই অত্যাচারটা আবার শুরু হয়।

চন্দনা ধার দেনায় খুবই জর্জরিত। ওর দাদারা ওকে বলে দিয়েছে যে ওরা দেখবে না। সেই জন্য ও ঠিক করেছে যে ও বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু বাড়িতে যেহেতু বাকি সকলের ভাগ আছে তো চন্দনা জানে না যে এই বিক্রিটা কিভাবে হবে? ও অন্য একটা পরিবেশে গিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। সুস্থভাবে ও যাতে নিজের মতো করে থাকতে পারে এবং কোন একটা অন্য কাজ করতে পারে সেটাই তার এখন প্রধান উদ্দেশ্য। চন্দনা বারবার আমাদের বলছিল যে ও চেষ্টা করছে ওর যদি কোন একটা দোকান হয় বা কিছু একটা ব্যবসা হয় বা নিজে থেকে যদি কিছু কিছু চালু করতে পারে

তাহলে খুব ভালো হয়। কিন্তু চন্দনা বুঝে উঠতে পারছে না সে কী করে এটা করতে পারবে।

ওর বাড়িতে মাসে প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা খরচা হয়। সেটা ওকে করতে হয়। বাড়িতে ওর মা এবং ওর একজন ডিভোর্সি দিদি আছে। তাদেরকে ও ফেলতে পারবে না। যখন ওর দাদার কোন কাজ ছিল না, তখন ওরা চন্দনারও হাতে পায়ে ধরেছিল যাতে চন্দনা ওদের সংসার চালিয়ে দিতে পারে। ও তখন মায়া করে এটা মেনে নিয়েছিল এবং বলেছিল যে ও যা জোগাড় করে আনবে তাই ওদেরকে খেতে হবে। এইভাবে ও ওর দাদার দরকারের সময় সাপোর্ট দিয়েছিল। ওর দাদার কাজে তারপর আবার স্টেবিলিটি আসে এবং ও কাজে চলে যায়।

এভাবেই চন্দনা নিজের জীবনের গল্প বলেছে যে প্রতি মুহূর্তে সে নিজেকে কীভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং আত্মমর্যাদার সাথে বাঁচার চেষ্টা করেছে। চন্দনার ইচ্ছা ও যেই পেশাটাই করুক সেটা যাতে সে সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে করতে পারে, ওর দিকে যাতে কেউ আঙুল তুলে কথা বলতে না পারে, এবং ও যেন একটা সুস্থ পরিবেশে বসবাস করতে পারে।

প্রদীপের নিচে আলো

বিকাশ মালদা জেলার বালুচর বলে একটি গ্রামে থাকে। ও খুবই গরীব ঘর থেকে উঠে আসা একজন ট্রান্সওম্যান। বিকাশের বয়স ছাব্বিশ এবং ও অগ্রসর জাতির অন্তর্ভুক্ত।

বিকাশ ছোটবেলা থেকেই নিজেকে মেয়ে বলে মনে করত। ওর পরিবারে ওর ওপর এই কারণে বিভিন্ন রকম অত্যাচার করেছে তাই সে নিজেকে মানিয়ে রাখত। আর কোনরকম মেয়েদের জামা-কাপড় না পরে, মেয়েদের সাজগোজ না করেই সে পড়াশোনা করতে যায়। সে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। স্কুলেও তার সঙ্গে নানা রকম হেনস্থা হয়। ক্লাস ফাইভে নতুন স্কুলে সে মাত্র তিনদিন স্কুল যেতে পারে এবং তারপর তাকে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয় এই সমস্ত অত্যাচারের জন্য।

বিকাশের বাবা শ্রমিকের কাজ করতেন। ওনার একবার টনসিল হয়, তারপর তিনি নানাভাবে বারবার অসুস্থ হতে থাকেন এবং তারপরে আর তিনি কাজ করতে পারছিলেন না। বিকাশের মা পরিচারিকার কাজ করেন। তাদের সংসারও ঠিক মতো চলছিল না, বিভিন্ন অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। বিকাশের যখন পনের বছর বয়স তখন সে একটি হোটেলে বাসন মাজা, ঝাঁট দেওয়ার কাজ শুরু করে। সেখানে সে প্রথমে দেড়শ টাকা রোজে কাজ শুরু করে। তারপরে বিভিন্ন রকম ভাবে আন্দোলন করে তার নিজের ভয়েসকে সে শক্তিশালী করে আপাতত সে তার মাইনেটা আড়াইশো টাকায় তুলে নিয়ে যেতে পেরেছে। এই কাজটার জন্য বিকাশকে প্রচুর শ্রম দিতে হয় এবং সে প্রতিদিন প্রায় সতেরো ঘন্টা এই কাজটা করে। এই কাজটাকে সে খুব হাসি খুশি ভাবেই মেনে নিয়েছে।

এই কাজের পাশাপাশি বিকাশ মনসা গানও করে। আষাঢ়-শ্রাবন-ভাদ্র, এই তিন মাস ও এই রামলীলা ও মনসা গানের সঙ্গে যুক্ত থাকে। রামলীলাতে কাজ করে ও টাকাটা একটু বেশি পায়। এই সমস্ত যাত্রাপালায় আগে ও থালা নিয়ে ঘুরত, এবং আশীর্বাদির টাকা তুলত দর্শকদের কাছ থেকে। একবার ওই পালার মুখ্য অভিনেতা কাজে আসেনি বলে বিকাশকে একটা রোল করার জন্য অফার করা হয় এবং সেটা ভালোভাবে প্লে করার পরে আস্তে আস্তে ওই কাজটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। এই সমস্ত যাত্রাপালার যে গ্রুপ লিডাররা আছে এবং যে অর্গানাইজাররা আছে, তারা বিকাশকে খুব পছন্দ করে এবং এর জন্য ও অনেক শো করতে পারে। এই কাজে ও আটশ থেকে নয়শ টাকা রোজ পায় কিন্তু এই পালার জন্য যে ড্রেস-মেকআপ এবং অন্য যা যা কিছু লাগে সেটা এই টাকার মধ্যে থেকেই তাকে কিনতে হয়।

বিকাশ খুব স্ট্রংলি নিজের পরিবারকে হ্যান্ডেল করে এবং ওর পরিবারের সাথে সাথে পারিপার্শিক যে জায়গাগুলো রয়েছে সেটা মেন্টেন করে চলে। পাড়ার লোক ওকে ছোটবেলা থেকেই চেনে এবং জানে যে ও নাচ-গান করে। সেজন্য পাড়ার লোক ওকে নিয়ে কোনো রকম ভাবে আপত্তি বা ওকে কোন হেনস্থা করে না। বিকাশ ওর পরিবারের জয় অর্থনৈতিক দেখাশোনা করে। ঘরের বিভিন্ন খরচ-খরচা দেয়। ও নিজের পরিবারের

জন্য বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে, বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি করিয়েছে এবং ও বছরে একটা ছট পুজো করে। প্রায় চৌদ্দ থেকে পনের হাজার টাকা খরচ হয়। এটা ওর একটা তোঁহার উৎসব, এটা ও পালন করে। বিকাশ কিন্তু নিজের সেভিংস এর জায়গাটা সবসময় মাথায় রাখে। ও এটা খুব সুন্দর ভাবে ম্যানেজ করতেও জানে, যে কতটা টাকা নিজের জন্য রাখতে হবে, কতটা নিজের ভবিষ্যতের জন্য, এবং পরিবারকে কতটা টাকা দিতে হবে।

বিকাশ এখন তাই নিজের জন্য হরমোন আর লেজার ট্রিটমেন্ট নিতে চায় এবং আরো সুন্দর হয়ে উঠতে চায়। বিকাশ ভবিষ্যতে হিজড়া পেশায় এবং তার মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে যেতে চায়। ও মনে করে যে ওখানে ও আরেকটু বেশি টাকা পাবে, হিজড়া পেশায় অনেক ইজ্জত ও মান সম্মানও পাবে। কিন্তু এটাও ও বলেছে যে, যদি অন্য কোন কাজ করে কুড়ি হাজার টাকার মতো যদি মাসে পায় তাহলে সে সেই কাজটাই করবে। তখন আর সে হিজড়া পেশায় যাবে না। ও আরো বলেছে যে পড়াশোনা জানে না বলেই হয়তো ও ওষুধ বা কাপড়ের দোকান বা পার্লারের কাজ, সে এই কাজগুলো করতে পারবে না। এই সমস্ত কাজে যৌন হ্যারাসমেন্ট বেশি হতে পারে বলে বিকাশের মনে একটা ভয়ও আছে। ও আরো বলেছে যে রেস্টুরেন্টে কাজের সময়ে তাকে বিভিন্ন কাস্টমার বিভিন্ন রকম কুপ্রস্তাব দিয়ে থাকে। এগুলো সে নানাভাবে ম্যানেজ করে চলে। ও বর্তমানে যে রেস্টুরেন্টে কাজ করে সেখানে ওর একটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে।

ওকে যখন আমরা জিজ্ঞাসা করি যে ক্ষমতায়ন কী, তখন ও বলেছে যে ওর কাছে ক্ষমতার কথা মাথায় এসেছে যখন ও কমিউনিটির আরো পাঁচটা লোককে দেখেছে। ওই বাকিদেরকে দেখেছে বলেই সে নিজের ক্ষমতায়নের কথা বলতে পারে। আজ যদি তাকে কেউ কোন কুমন্তব্য করে, তাহলে সে উঠে তার প্রতিবাদ করে। কিন্তু ও এটাও বলেছে যদি হঠাৎ করে দশটা ছেলে তাকে যদি ঘিরে ধরে, তার প্রতিবাদ ও করতে পারবে না। লোকাল একজন ট্রান্স অ্যাক্টিভিস্টের কাছ থেকে বিকাশ সাপোর্ট পায়, এবং সেই সাপোর্ট আছে বলে বিকাশ এখন অনেক কম ভয় পায়। বিকাশ মনে করে যে কমিউনিটির মানুষের কাছে পয়সাটা এক রকম ক্ষমতায়ন। ও বলেছে যে পরিবারকে ওকে যে টাকাটা দিতে হয়, সেটাও কোতি বলেই ওকে দিতে হয়। ও যেহেতু পরিবারকে খরচ খরচা দেয়, ওদের বাড়ি ঘর বানিয়ে দিয়েছে, সেই জন্য ওর এখন আর কোন অসুবিধা নেই।

বিকাশ কঠোর পরিশ্রম আর নিয়মশৃঙ্খলার মাধ্যমে নিজের জন্য একটা মর্যাদার এবং কিছু নিরাপত্তার জায়গা গড়ে নিতে পেরেছে। বিকাশ হাসিমুখে সমাজের বিভিন্ন উৎপীড়ন আর বৈষম্যের মোকাবিলা করে নিজের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

নানা রঙের ফুলের হাসি

সজল থাকে শেওড়াফুলিতে। সজল নিজেকে একজন উচ্চ বংশের সন্তান বলে বলেছে, যে নিজেকে নন বাইনারি গে বলে আইডেন্টিফাই করে।

সজলের সাথে আমরা যখন গল্প বলছিলাম ও আমাদেরকে ওর জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে শোনাচ্ছিল। একটা ইম্পরট্যান্ট ব্যাপার হচ্ছে, সজলের অর্থনৈতিক ভাবে স্থিতিশীল। ওর ফ্যামিলিও ভীষণভাবে সাপোর্টিভ। সজল রবীন্দ্রভারতী থেকে ভারতনাট্যমে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছে। সজল তার প্রফেসান হিসেবে মূলত নাচটাকেই বেছে নিয়েছে,। বাংলা বিহারে মাড়োয়ারি সমাজে যে সমস্ত বিয়েবাড়ি, পুজো-আর্চা, বা ধর্মানুষ্ঠানে যে নাচ-গান হয় তাকে জাগরণ বলে। ভারতনাট্যমের পাশাপাশি এই কাজটাও সজল করে। সজল জাগরণ করার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় রাধা-কৃষ্ণের পারফরমেন্সও করে। ও নিজে কৃষ্ণ সাজে। কৃষ্ণের সাজগোজের জন্য প্রয়োজনীয় সব অর্নামেন্ট-জুয়েলারি-ড্রেস সেটআপ সবই ওর নিজের।

জাগরণের কাজটা খুবই সিজনাল বিজনেস। ওদের মোটামুটি সারা বছরই শো থাকে। বছরে দুমাস মত বন্ধ থাকে, কিন্তু বাদবাকি সময় কাজ হয়। আর এই দু মাস ও পার্টি মেকাপের কাজ করে। মান্থলি এই শো করে সজল প্রায় তিরিশ হাজার টাকা মত কামাই করে আর মেকাপের কাজ করে ওর পাঁচ হাজার টাকা মতো আয় হয়।

সজলের বাবা একটা জায়গা কিনেছে, ওর ভবিষ্যতে ইচ্ছা আছে যে ওই জমিতে ও একটা স্কুল বানাতে চায় এবং নাচ শেখাতে চায়। এর সাথে ওর একটা গ্রুপ খোলারও ইচ্ছা আছে। ওর মোটামুটি একটু সেভিংস আছে। সজলের বাড়িতে সেরকম কোন খরচা নেই। কোন টাকা পয়সা দিতে হয় না। ওর মাসে প্রায় হাত খরচ লাগে ছয় থেকে সাত হাজার টাকার মত।

সজল এই কাজটা খুব ভালবেসে করে। কিন্তু এই কাজে আর্টিস্টের মর্যাদা পেতে সজলকে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে। আগে এই জাগরণের বিভিন্ন ডান্স গ্রুপ ছিল, সেখানে সজল সবার সাথে মিলেমিশে কাজ করত। তারপর যখন কোভিড প্যানডেমিক শুরু হয় তখন বিভিন্ন সময়ে এই গ্রুপের যে লিডাররা ছিল যারা এই যে গ্রুপগুলো পরিচালনা করত, তারা এদেরকে ঠিকঠাক পেমেন্ট দিত না। এদের যে পয়সাটা ন্যায্য সেটাই এরা পেত না। অনেক পয়সা কেটে নেওয়া হত। আর কারণ হিসেবে লকডাউনকে দেখানো হত। কিন্তু এরা খোঁজ খবর করে জানতে পারল যে সেটা আদৌ কোন অসুবিধা ছিল না। অর্গানাইজাররা যা পেমেন্ট দেওয়ার কথা, সেটা ঠিক-ঠাকই পেমেন্ট করত, কিন্তু এই গ্রুপ লিডাররা সেই পয়সাটা এদেরকে ঠিকঠাক দিত না, নিজেরা অনেক বেশি কমিশন রাখত।

২০২২-২৩ সালে ডায়মন্ড হারবারে এরকম একটা অর্গানাইজারের প্রোগ্রামে এরা প্রায়

দশজন, যারা কৃষ্ণের রোল করে, তারা ওই শো তে গিয়েছিল। সেখানে এরা আলোচনা করতে থাকে যে ওদের কাজের জায়গা, ব্যবহার, ট্রিটমেন্ট টা কতটা অপমানজনক ও শোষণপূর্ণ। তার সঙ্গে সঙ্গে ওরা আর্টিস্ট হিসেবেও একটা মর্যাদা চায়। ওরা চায় ওদের আরো ভালো ট্রাভেল যাতে দেওয়া হয়, ওদেরকে যাতে গাড়ি করে নিয়ে যেতে হয় বা মিনিমাম থ্রি-টিয়ার এসি ট্রেনের টিকিট যাতে দেওয়া হয়। আগের মতো যাতে লোকাল বা স্লীপার ক্লাসে যাতে যেতে না হয়। ওরা চায় ওদের যেন প্রপার থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হয়। ওরা তার সাথে সাথে বেশি রেটও চায় কারণ ওরা একটা কোয়ালিটির কাজ প্রোভাইড করে যেটা মার্কেটের বাকিদের থেকে অনেক বেটার। ওরা একটা হোয়াট্সঅ্যাপ গ্রুপ বানিয়ে সবার সাথে কথাবার্তা করে নিজেদের কাজের রেটও ঠিক করে। ওরা কলকাতার ভেতরের এক রেট রেখেছে এবং কলকাতার বাইরের আরেকটা রেট। এটা ওরা সবাইকে জানায়ও যে রেটটা কী হবে। যাতে রেফারেন্স নিয়ে অর্গানাইজাররা যার কাছেই যাক না কেন সবাই যাতে একই রেট বলে।

আমরা যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন এই গ্রুপটা বানিয়েছিলে তো সজল বলেছিল যে যদি একজন আইটেম ড্যান্সার এক ঘন্টা কাজ করতে যদি চল্লিশ হাজার টাকা নেয় বা যদি একজন অ্যাঙ্কর একদিনে পঁচিশ হাজার টাকা নেয়, তাহলে কৃষ্ণ কেন পাবে না। কারণ কৃষ্ণ তো এই শো এর একটা অন্যতম বড় চরিত্র। তো সেই চরিত্র কেন কষ্ট করে যাবে, কম টাকা পাবে? এইটা কীভাবে ঠিক করবে, কীভাবে অর্গানাইজারদের অ্যাপ্রোচ করবে, সেটা বুঝতেই ওরা এই গ্রুপটা বানিয়েছিল। সজল আরেকটা জিনিস বলেছে যে ওরা যদি ভাবে ওরা আরো এক হাজার টাকা বাড়াবে, তাহলে ওদের কীভাবে মেন্টেনেন্স করতে হবে, কীভাবে গ্রুমিং করতে হবে, কী ড্রেস পরতে হবে, কী সাজসজ্জা করতে হবে, সেটাও একটা ভাবার বিষয়। কারণ এর সঙ্গে ওদের পেশার খুশিটা জড়িত আছে। এটার উপরে ও অনেক জোর দিয়েছে। এদের এই গ্রুপটা খুবই সাকসেসফুল হয় এবং ওরা নিজেদের মধ্যেই নেটওয়ার্কিং করেই এই কাজটা করেছে। এটাকেই ও নিজের ক্ষমতায়ান বলে মনে করেছে। কাজ করতে গেলে কাজের যে ক্ষমতায়নের জায়গাটা, যে সম্মানের জায়গা, যে মর্যাদার জায়গা, একটা ফেয়ার পে বা সঠিক পারিশ্রমিকের জায়গাটা, সেটা তারা একটা আন্দোলন করে ছিনিয়ে এনেছে।

ভালবাসার জিৎ

প্রতীকের বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। প্রতীক নিজেকে ট্রান্সম্যান বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। প্রতীক ফরওয়ার্ড ক্যাস্ট। প্রতীক মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। পরে পরিবারের চাপে পড়াশোনা ছেড়ে কাজে ঢুকতে বাধ্য হয়।

প্রতীকের বাড়ি কলকাতার কসবা এলাকায়। প্রতীকের বাড়িতে মা বাবা আর দিদি আছে। ওর মা অসুস্থ। প্রতীক ওর বউয়ের সাথে আলাদা থাকে। প্রতীকের বউ ওর জন্য একটা খুব সাপোর্টের মানুষ। প্রতীকের বউয়ের পরিবার ওকে জামাই হিসেবে মেনে নিয়েছে। প্রতীকের পরিবার প্রতীকের বউকে পছন্দ করে, কিন্তু বাড়ির বৌমা হিসেবে মেনে নেয়নি। বন্ধু হিসেবেই মেনেছে। প্রতীকের দিদি এখনো প্রতীককে বোন বলে ডাকে, যেটা ও একদম পছন্দ করে না। ওর দিদি চায় কি প্রতীকের ভাগের সম্পত্তিটা প্রতীক ওর মেয়ের নামে করে দিয়ে যাক।

প্রতীক যখন কাজ শুরু করল, তখন ও অনেক ধরনের কাজ করেছে। ও আগে ঘুরে ঘুরে সেলস এর কাজ করত, তারপর আইডিয়া আর ভোডাফোনে ডেটা এন্ট্রির কাজও করেছে। তারপরে সিকিউরিটি গার্ডের কাজও করেছে। তখন ও নিজের জেন্ডার সম্বন্ধে ভাবতো কি ও একজন টমবয়, বাকি মেয়েদের থেকে আলাদা। পরে ও নিজেকে ট্রান্সম্যান বলে বুঝতে পেরেছে। তখন ওকে অনেক বৈষম্য ফেস করতে হয়েছে। ওকে বেশি করে খাটাতো, লেটনাইট করে ছাড়তো, কাজের অনেক প্রেসার ছিল। কিন্তু ও এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। কাজ খুঁজতে গিয়েও ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে। ওর আধার কার্ড এখনো চেঞ্জ হয়নি। প্রতীক ইন্টারভিউ এর জন্য কল পেতো, কিন্তু ওকে সামনাসামনি দেখে তারপরে মানা করে দেওয়া হতো, বা কাজ দেওয়া হতো না।

কোভিড যখন শুরু হলো, প্রতীক একজন বন্ধুর মাধ্যমে নিউ টাউনের চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে হাউসকিপিং এর কাজ পেয়েছিল। এই কাজটা কন্ট্রাকচুয়াল ছিল এবং প্রতীক ওইখানে দেড় বছর কাজ করেছে। এই সময় ওর মা অসুস্থ হয়ে পড়াতে ও কাজ ছেড়ে দেয়। ওর তখন যা সঞ্চয় ছিল সেটা হসপিটাল আর ওষুধের জন্য খরচাও হয়ে যায়।

এখন প্রতীক রাইড-শেয়ারে বাইক চালায়। সেটাতে ওর দশ থেকে পনের হাজার মতো প্রায় মাসিক ইনকাম হয়, কিন্তু এই পুরো টাকাটাই ওর মা-বাবার উপরে খরচা হয়ে যায়। ওদের সংসার প্রতীকই দেখে। ওর নিজের খরচার জন্য ওর বউ ওকে সাপোর্ট করে। ওর ওয়াইফ ওকে স্কুটি কিনে দিল যেটা দিয়ে ও আজকে বাইক-ট্যাক্সি চালাতে পারছে। কিন্তু তাও ওর পরিবারের ওকে মেনে নিতে অসুবিধা হচ্ছে। প্রতীক বলছে, *"আমি যদি টাকা না দিই, তাহলে কাল থেকেই আমাকে দূর-ছাই করবে। সংসার চালাচ্ছি তাই মেনে নিচ্ছে। টাকাটাই আমার কাছে ক্ষমতা।"*

বাইক চালাতে গিয়েও প্রতীককে অনেক রকমের বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। যেমন ওর আইডেন্টিটির একটা হরণ হচ্ছে। প্রতীক পে টয়লেট ইউজ করতে অনেক অসুবিধা ফেস করছে। ওকে যেইখানে চেনে একমাত্র সেখানেই ইউজ করতে পারে। মাঝে মাঝে টয়লেট ইউজ করার জন্য ওকে বলতে হয়েছে যে *"আমিও মেয়ে"*। বেশি রাত্রি হলে ও দূরে যায় না। ওর অনেক অসুরক্ষিত মনে হয়। রাত্রিবেলায় কাস্টমারদের সাথে ও বেশি কথা বলতে চায় না, চুপ করে থাকে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম কি রাত্রিতে যদি কোন ইমারজেন্সি হয় তাহলে কোম্পানি থেকে কোন সাপোর্ট পায় কিনা? প্রতীক বলল যে ওরা কল করলে ধরে না, আর আসতেও দেরি করে।

ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রতীক বলল *"আমি সাধারণ একটা মানুষ। আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি চাই আমার পয়সা-কড়ি হলে, আমি নিজের হরমোন থেরাপি করাব। আমি নিজের পড়াশুনা আর কম্পিউটার শেখা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমি একটা ভালো অফিস জব পেতে চাই।"*

বাঁধ ভাঙার গল্প

সম্রাট একজন ঊনত্রিশ বছর বয়সের ট্রান্সম্যান। সম্রাট তার পরিবারকে নিয়ে হালতুতে থাকে। ও জয়েন্ট ফ্যামিলি সেট আপে থাকে। ও, ওর বাবা, আর ঠাকুমার সাথে একটা বাড়িতে থাকে। সম্রাট ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে।

সম্রাট ছোটবেলা থেকে ছেলে হিসেবেই আইডেন্টিফাই করত। সুযোগ পেলে ছেলেদের জামা কাপড় পরত। একবার পুজোতে মা ওকে জোর করে শাড়ি পরিয়ে ছিল, তারপরে হাঁটতে গিয়ে শাড়ি খুলে গেছিল। বাড়িতে এসে ওর মা তখন ওকে অনেক বকাবকি করেছিল। কিন্তু সম্রাটের যখন ষোল-সতের বছর বয়স, তখন ওর মা ওদের ছেড়ে চলে যায়। সম্রাট ওর পরিবারে বড় ছিল। ও কোন কাজ করছিল না। ওর বাবা তখন ওকে অনেক খোঁটা দিত। তখন সম্রাটের অমতে ওর বাড়ির লোকজন জোরজবরদস্তি করে ওর বিয়ে দিয়ে দেয়। সেখানে সম্রাট দেড় বছর সংসারও করে। তখনও মানসিকভাবে ওর ফিলিংস একটা ছেলের মত ছিল। ওর মরদের শারীরিক কোন প্রবলেম ছিল। তাই ওর শ্বশুর ওর মরদের জায়গাটা নিতে চেয়েছিল। সম্রাট তখন ওর বাবার বাড়িতে ফেরত চলে আসে। ওর শ্বশুরবাড়ির লোক তারপরে ওকে নিতে এসেছিল, কিন্তু সম্রাট চায়নি ফিরে যেতে। ও তারপরে ডিভোর্স নিয়ে নেয়।

ডিভোর্সের পরে সম্রাট দুটো বাড়িতে কাজ করতে লাগে। তখন ও কিছু বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে নেশায় অ্যাডিক্টেড হয়ে যায়। ওর ব্যাংকে দশ হাজার টাকা মত ছিল। সেগুলো সব খরচা করে ফেলে। তখন ওর বড় পিসি ওকে বোঝায় আর ওর দায়িত্ব নেয়। ও তখন এসব থেকে সরে এসে ছয় সাত বাড়িতে কাজ করতে শুরু করে। আজকে ও মাসে ছয় থেকে সাত হাজার টাকা ইনকাম করে। ও ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ করে। যাদের কাছে কাজ করে তাদের সিডিউল অনুযায়ী ওকে অনেক টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হয়। সম্রাট হাফ প্যান্ট পরে কাজে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ও বললো যে কাজের জায়গাতে ওর জেন্ডার আইডেন্টিটি নিয়ে কোন প্রবলেম হয় না। যে যে বাড়িতে কাজ করে, তারাও ওকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে।

সম্রাট জানাল যে ওর কোন লোন নেই। কিন্তু ও বাবা আর ঠাকুমার ঘরে ইএমআই তে একটা এসি লাগিয়ে দিয়েছে। যেটা ও নিজের ইনকাম থেকেই শোধ করে। সম্রাটের নিজের দুটো এলআইসি আছে, আর ওর বাবার একটা এলআইসি আছে। যেটা সম্রাটই চালায়। ও কিছুটা টাকা নিজের হাত-খরচ হিসেবে রেখে বাকিটা পিসির হাতেই দেয়।

সম্রাট খুব তবলা আর ড্রামস বাজাতে ভালবাসে। ও ছোটবেলায় যখন স্কুলে পড়ত, ফাঁকা টাইমে টেবিল চেয়ার বাজাত। ওর সায়েন্সের টিচারের সেটা ভালো লাগে এবং উনি রিটায়ারমেন্টের সময় সম্রাটকে একটা তবলা গিফট করেছিলেন। সেটাতে সম্রাট নিজের মতো করে তবলা বাজাতে আরম্ভ করেছিল। তখন ওর কোন টিচার ছিল না

সম্রাট সকালবেলায় প্রথমে যাদের বাড়িতে কাজ করতে যায়, সেই পরিবারটা খুবই সাংস্কৃতিক পরিবার। ওদের সঙ্গীত আর আবৃত্তি নিয়ে অনেক আগ্রহ ও চর্চা আছে। ওরা যখন জানতে পারে যে সম্রাট তবলা শিখতে ইন্টারেস্টেড, তখন থেকে ওরা ওকে অনেক সাপোর্ট করেছে। ওরাই ওকে একটা তবলার টিচার পাইয়ে দেয়, যে এখন বিনা পারিশ্রমিককে সম্রাট কে তবলা শেখায়। সম্রাট মন দিয়ে তবলা বাজানো শিখতে চায়। ও খুব কম সময়ে তাল তুলে নিতে পারে, কিন্তু বাড়ির কাজ শেষ করার পরে সময়ের অভাবে সবসময় সে তবলার ক্লাসে যেতে পারে না। সেই জন্য তবলার টিচার ওকে উপদেশ দিয়েছে যে সম্রাট দুপুর বেলা ক্লাস করতে আসুক। ওর টিচার ওকে খুব সাপোর্ট করে আর চায় কি ও একটা ভালো জায়গাতে যাক। সম্রাটের কাজের বাড়ির কাকু-কাকিমারাও ওকে ক্লাসে যেতে বলে, কিন্তু সম্রাট বলল যে এটার একচুয়াল মানে হচ্ছে *"আগে আমাদের কাজ শেষ কর, তারপর যা"*। সবাই ওকে উৎসাহিত করে শেখার জন্য, কিন্তু কেউ টাইম দেয় না। সম্রাটের একটা গর্বের জায়গা আছে যে ও একবার এই টিচারের বাড়িতেই সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেছিল।

আমরা যখন জিজ্ঞাসা করলাম যে ক্ষমতা মানে কি? সম্রাট বলল যে "ক্ষমতা মানে টাকা"। ও উদাহরন দিল যে, *"কেউ যদি আমার কাছে পাঁচশ টাকা চায় সেটা আমি দিতে পারব, কিন্তু যদি কেউ দু-হাজার টাকা চায়, সেটা দেওয়ার আমার তো ক্ষমতা নেই।" সম্রাট আরো বললো যে ক্ষমতা হচ্ছে টাইম, "আমি যদি বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যেতে চাই আমাকে একদিন ছুটি দিতে পারে, কিন্তু দুদিন ছুটি কেউ দেবে না। আর কাজ ছেড়ে দুই দিন ছুটি নেওয়ার ক্ষমতাও আমার নেই।"*

সম্রাট জানাল যে ভবিষ্যতে ও তবলাটা আরো ভালো করে শিখে একটা ভালো জায়গাতে পৌঁছাতে চায়, যেখানে ওকে পেছন ফিরে দেখতে না হয়। সুযোগ পেলে সম্রাট একটা দোকান দিতে চায়। আর ও নিজেকে পুরো ছেলের মত পরিবর্তন করতে চায়। সম্রাট গর্ববোধ করে যে ও তবলা বাজাতে পারে, যে ও সবাইকে হাসিখুশি রাখতে পারে, আর ও কাজের পরে পরিবারকে টাইম দিতে পারে।

শেষে সম্রাট এটা বলল যে, *"সমাজে পরিবর্তন আনতে হবে যাতে আমরা মাথা উঁচু করে চলতে পারি, কেউ আঙ্গুল তুলে বলবে না যে আমরা মেয়ে। যাতে আমরা স্যান্ডো গেঞ্জি পরেও রাস্তায় হাঁটতে পারি। করব, লড়ব, জিতব। আমি বাঙালি, আমি গর্ব বোধ করি। আমি ট্রান্স, আমি গর্ব বোধ করি।"*

পরিশেষে

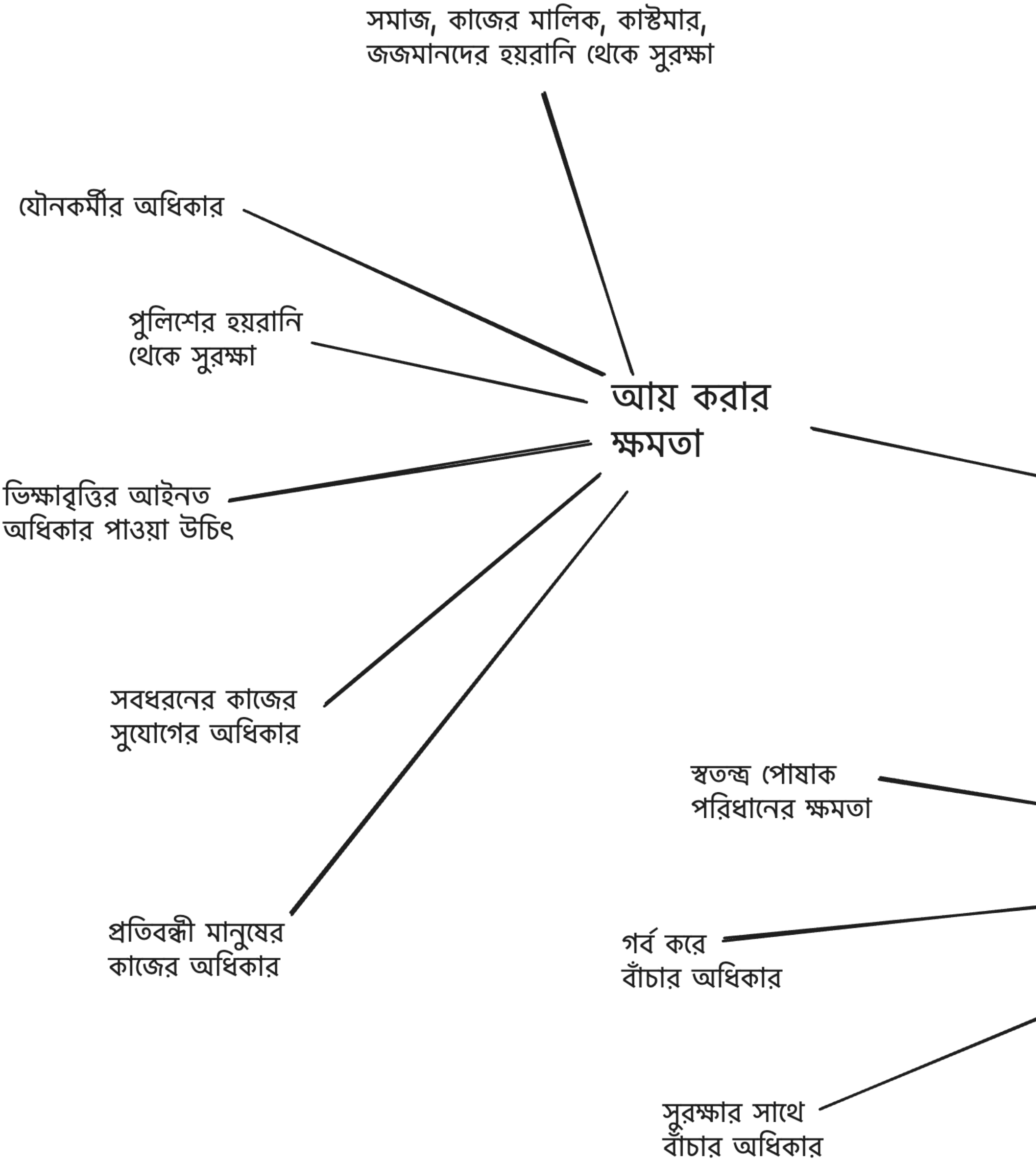
এই শেষ অধ্যায়ে আমরা এই গল্পগুলির বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলটা সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছি। এটা করার জন্য আমরা প্রতিটি গল্পের মধ্যে অংশগ্রহণকারীরা কীভাবে তাদের ক্ষমতায়নকে উপলব্ধি করেছে, কাদের কাছ থেকে আর কোথায় কোথায় তারা তাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমর্থন পেয়েছে, আর তাদের কাছে নিজেদের লিঙ্গ পরিচয়ের স্বীকৃতি কতটা অর্থবহ, সেটাই দেখেছি। কোভিড লকডাউন অংশগ্রহণকারীদের উপর কী কী প্রভাব ফেলেছে সেটার বিশ্লেষণ করেছি। বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী ভাবছে সেটা বোঝার চেষ্টা করেছি। আর আমাদের আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসা নীতিগত অবস্থান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

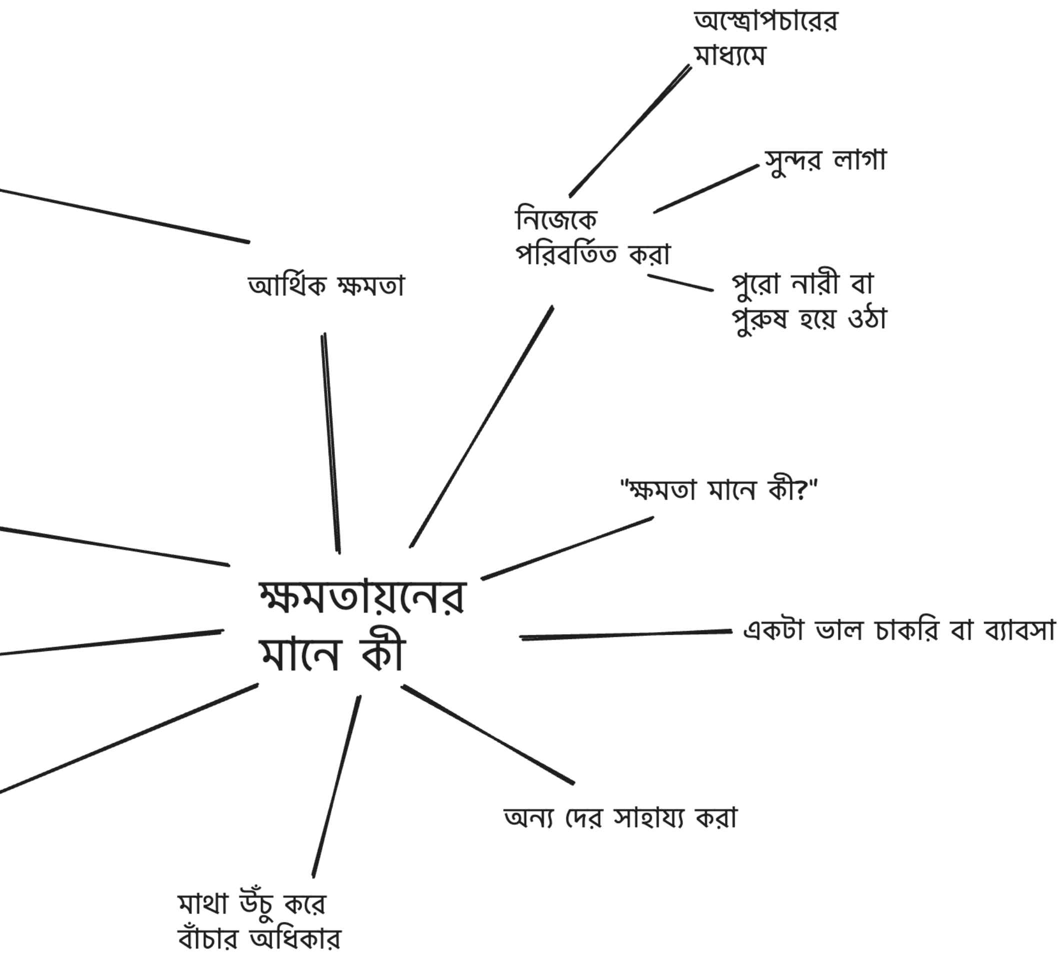
আমরা আমাদের বিশ্লেষণগুলি দেখানোর জন্য কয়েকটা চার্ট বানিয়েছি। বিভিন্ন জনের উল্লিখিত পয়েন্টগুলি আমরা আলাদা আলাদা করে লিখেছি। এগুলো কোন একজনের বলা কথা নয়, এবং এগুলি সরাসরি উদ্ধৃতিও নয়।

পরের পাতাগুলিতে দেওয়া প্রথম দুটি চার্টে আমরা পরিবেশন করেছি
১) ক্ষমতায়ন বলতে আমাদের অংশগ্রহনকারীরা কী বোঝে, আর
২) ক্ষমতায়নের পথে অংশগ্রহনকারীরা কোথায় বা কার কাছে সমর্থন পেয়েছে।

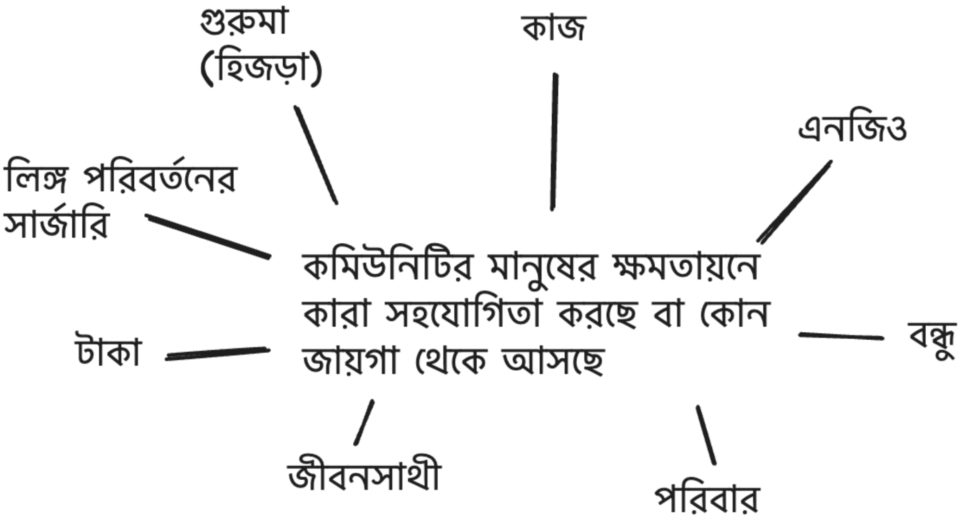
- পরের পাতায় পূর্ণ চিত্র -

চার্ট ১: আমাদের গবেষণায় অংশীদারী মানুষদের কাছে ক্ষমতায়নের অর্থ কী?




ক্ষমতায়নের মানে কী
আর্থিক ক্ষমতা
নিজেকে পরিবর্তিত করা
অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে
সুন্দর লাগা
পুরো নারী বা পুরুষ হয়ে ওঠা
"ক্ষমতা মানে কী?"
একটা ভাল চাকরি বা ব্যাবসা
অন্য দের সাহায্য করা
মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার

চার্ট ২: ক্ষমতায়নের যাত্রায় গবেষণার অংশীদাররা কোথায় বা কার কাছে সমর্থন পেয়েছে?



এখানে আমরা পরিবার, বন্ধু, জীবিকা, এবং রূপান্তরিত হওয়ার ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

গবেষণার অংশীদারদের সাথে তাদের পরিবারের বিবিধ প্রকারের সম্পর্ক। বেশ কিছু জন একটা সময় পরে তাদের পরিবার বা পরিবারের বিশেষ কয়েকজন, যেমন তাদের মা, ঠাকুমা-দিদা, দিদি বা বোন, বা ভাইপো-ভাগ্নের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। কিন্তু এরা অনেকেই জানিয়েছে তারা বিশেষত তাদের শৈশবে বা কৈশোরে কীভাবে পরিবারের হাতে নানারকম শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়েছে। আমরা আগেই জানিয়েছি যে আমাদের গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় চুয়াত্তর শতাংশ জানিয়েছে যে তারা তাদের জন্মগত পরিবারের সাথেই থাকে। কিন্তু আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে এই ক্ষেত্রে প্রায় সব অংশগ্রহণকারীরা তাদের জন্মগত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। যদিও কিছু কিছু অংশগ্রহণকারী জানিয়েছে তারা তাদের পরিবারের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা বা কর্তব্যের খাতিরে টাকাটা দিয়ে থাকে, কিন্তু অন্য অনেকেই বলেছে যে পরিবারের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা এই আর্থিক সাহায্যের উপরেই নির্ভর করে।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী কয়েকজনের কাছে তাদের বন্ধুরাই তাদের ক্ষমতার উৎস। সজল যেমন বলেছে ও কীকরে তার মতো আরো অন্য কৃষ্ণ-পারফরমার দের সাথে মর্যাদাপূর্ণ কাজের পরিবেশ এবং উচ্চ পারিশ্রমিকের জন্য একসাথে তাদের ক্লায়েন্টদের সাথে দরাদরি করেছে।পুনীতা, মুকুল, রচনা, আর মধু যৌনকর্মীদের কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও সম্মানের দাবিতে লড়াই করছে, তারা কাজের জায়গায় আর জীবনে চলার পথে একে অপরের পাশে দাঁড়াচ্ছে। রাজ আমাদের বলেছে ও কীভাবে ওর বন্ধুর মধ্য দিয়ে আশা খুঁজে পায় এবং তাই ও বম্বে গিয়ে ওর বন্ধুর সাথে বার ড্যান্সার হিসেবে কাজ করতে চায়। কয়েকজন অংশগ্রহণকারী এটাও জানিয়েছে যে ওদের নিজেদের লিঙ্গ পরিচিতিতে আত্মসম্মান আনতে বা যৌনকর্ম বা ভিক্ষার মত সামাজিক কলঙ্কযুক্ত কাজটা সাহসের সাথে করতে পারার পেছনে ওদের অন্য ট্রান্স বন্ধু বা উপদেষ্টার অবদান আছে।

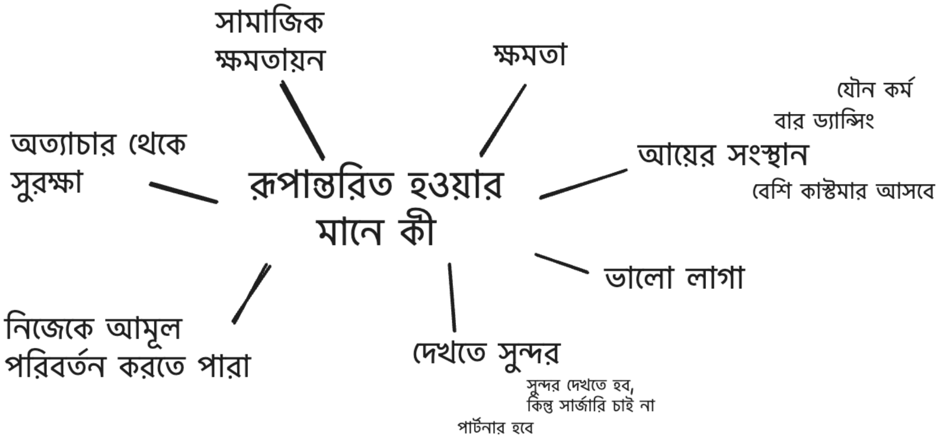
কর্মক্ষেত্রও বিভিন্ন সময়ে কখনো ক্ষমতায়নের বা কখনো নির্যাতনের জায়গা হয়ে উঠেছে। বহু অংশগ্রহণকারীরাই তাদের কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য, স্বল্পবেতন, আর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের কথা তুলেছে। অনেক কর্মক্ষেত্রেই তারা এটা বজায় রাখতে অপারগ ছিল।কিন্তু কিছু অংশগ্রহণকারীরা তাদের আনন্দ বা কণ্ঠ বা আত্মসম্মান বা সামাজিক অবস্থান বা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কিন্তু তাদের কাজের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে। তা সে কাজটা ভিক্ষা, যৌনকর্ম, রান্নার কাজ, পরিচারিকার কাজ, বাইক ট্যাক্সি চালানোর কাজ, মনসা পালায় অভিনয়, যাত্রা, জাগরন, কাপড় বেচা, যাই হোক না কেন।

নিজের লিঙ্গ পরিচয়ের রূপায়ণে আমাদের গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল, যার সাথে তাদের ক্ষমতায়নের সম্পর্কও রয়েছে।

আলাদা আলাদা অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের রূপান্তরিত করা নিয়ে বিভিন্ন মতাদর্শ ও আবেগ প্রকাশ করেছে। অনেকেই নিজেকে রূপান্তরিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তার সাথে এটাও বলেছে যে নিজের মতন কাপড় পরাটা একটা মৌলিক অধিকার। অনেকেই হরমোন নিয়ে বা স্তনের অস্ত্রোপচার করিয়ে বা লিঙ্গের অস্ত্রোপচার করিয়ে শারীরিক রূপান্তরের কথা বলেছে বা ইতিমধ্যেই করিয়েছে।

পরের পাতায় চার্টটিতে আমরা দেখাতে চাইছি অংশগ্রহণকারীরা রূপান্তরিত হওয়াটা কী চোখে দেখছে

চার্ট ৩: এই চার্টে আমরা অংশগ্রহণকারীদের কাছে রূপান্তরিত হওয়ার বিভিন্ন মানে গুলি লিখেছি। রূপান্তরিত বলতে আমরা অংশগ্রহণকারীদের করা যে কোন রকম শারীরিক বা সামাজিক রূপান্তর বলতে চাইছি



কোভিড লকডাউনের ইম্প্যাক্ট

কোভিড লকডাউন বহু অংশগ্রহণকারীদের জীবনে খুবই নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। অনেকে কর্মহারা হয়েছে, ভিক্ষা পেশায় থাকা মানুষদের ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার দরুন উপার্জন ব্যাহত ছিল। অনেক অংশগ্রহণকারী যৌনপেশা চালু করে। অনেক অংশগ্রহণকারীই জানিয়েছে যে তারা বিভিন্ন এনজিও, সিবিও, বা অন্যান্য সমাজকর্মী দের দেওয়া রেশন খেয়ে বেঁচে থেকেছে। কিন্তু কাজ না থাকার জন্য তাদের ঘরভাড়া দিতে, কারেন্টের বা ওষুধের খরচা ওঠাতে খুব অসুবিধা হয়েছে। কয়েকজনের খাবারের টাকাও ছিলনা।

লকডাউন ওঠার পর অনেকেই তাদের কাজ ফেরত পায়নি। অনেকে লকডাউনের সময় যে কাজ পেয়েছিল সেটা থেকেও ছাঁটাই হয়ে যায়। অনেককেই ভিক্ষা বা যৌনপেশায় যোগ দিতে হয়। লকডাউনের পরে যৌনকর্মীরাও অনেক কম কাস্টমার পাচ্ছে।

এরপর আমরা দেখছি আমাদের গবেষণার অংশগ্রহণকারীরা তাদের ভবিষ্যৎ টা কীভাবে কল্পনা করছে বা কী কী স্বপ্ন দেখছে।

চার্ট ৪: এই চার্টে আমরা দেখতে চাইছি অংশগ্রহণকারীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

হিজড়ে পেশা

ভিক্ষাবৃত্তি

দোকান

ঘুরতে চাই

নিজের আমূল পরিবর্তন করা

বার ড্যান্সিং

রেস্টুর‍্যান্ট

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

পার্টনার হবে

মেক আপ পার্লার

আর্থিক সুরক্ষা

বাড়ি করা বা ফ্ল্যাট কেনা

ড্যান্সার

যৌন কর্ম

ভালো অফিসে চাকরি

পরিবারকে দেখতে চাই

পড়া শোনা

আর সবশেষে বিভিন্ন নীতি প্রাসঙ্গিক যে আওয়াজ গুলো আমাদের অংশগ্রহণকারীদের সাথে করা বার্তালাপ থেকে উঠে এসেছে তা আমরা পঞ্চম চার্টে দেখিয়েছি।

- পরের পাতায় পূর্ণ চিত্র -



চার্ট ৫: তৃণমূল স্তরের রূপান্তরকামী মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য প্রাসঙ্গিক কিছু নীতিগত দাবি।

সি

ভিক্ষাবৃত্তির আইনত
অধিকার পাওয়া উচিত

বাড়ি ভাড়া
করার অধিকার

যৌন হেনস্থা
থেকে সুরক্ষা

সবধরনের কাজের
সুজোগের অধিকার

কম সুদে লোনের
সুযোগ করে দেওয়া

পড়াশোনার
সুযোগ

যৌনকর্মীর
অধিকার

সরকারি পাট্টার জমি
দেওয়া এবং পুনর্বাসনের
ব্যবস্থা

এরকম নয় যে কাগজে-কলমে এরকম নীতি নেই, সমস্যা যে এই নীতি গুলি কেবল কাগজেই থেকে গেছে। নীতি থাকলেও তার সুবিধা কেউ নিতে পারছে না। কারোর কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য সে কীভাবে প্রমান করতে পারে? প্রমানের বোঝা প্রান্তিক মানুষের উপরেই কেন? তাদের কাছ থেকে সময়, প্রচেষ্টা, শ্রম, অর্থ কেন আশা করা হবে? এতসব ঝামেলায় না গিয়ে তাদের কষ্ট-হেণস্থা ভুলে তারা নতুন কাজের সন্ধানে যায়। এই সমস্ত নীতির পরিবর্তনের জন্য আরো বেশি অ্যাডভোকেসি প্রয়োজন।

যে অ্যাকাডেমিকরা রূপান্তরকামী মানুষদের জীবনের ওপরে গবেষণা করছে, তাদের কমিউনিটির মানুষদেরকে নিয়ে একসাথে কাজ করা উচিৎ। আমাদেরকে বিশ্লেষণের জায়গাতে রাখা হয়না। আমাদেরকে গবেষণার ফলাফলটাও জানানো হয়না। প্রান্তিক স্তরের মানুষদেরও সমর্থন এবং সম্মানের সাথে গবেষণা করার অধিকার আছে। প্রান্তিক স্তরের কমিউনিটির মানুষদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে এই কাজের জন্য। আমরাও সহ-গবেষক হতে পারি!

সবশেষে আমরা এটাই বলব যে আমাদের অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে জানলাম যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৃণমূল স্তরের রূপান্তরকামী মানুষজন স্ট্রাগল করছে, তার সাথে সাথেই মাথা উঁচু করে নিজেদের পরিস্থিতি আর সমাজের মাঝে মর্যাদার সাথে বাঁচার লড়াই করছে। তাদের এই সংগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে তারা নিজেদের পারিপার্শ্বিক সমাজেও পরিবর্তন আনছে। এটাও লিঙ্গবৈষম্য বিরোধী আন্দোলন। এরা নিজেরাই এক একটি বিদ্রোহ বহন করছে, বাঁচার জন্যেও, আবার সমাজ বদলের জন্যেও। এরাই তো এই আন্দোলনের অগ্রদূত।

আমরা চাই তৃণমূল স্তরের রূপান্তরকামী মানুষদের এই আন্দোলন চলতে থাকুক। আশা রাখি সকলকে এক জোট করার এই সংগ্রাম জারি থাকুক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের আমাদের উপর আস্থা রাখার জন্য এবং তাদের গল্প বলার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

অংশগ্রহণকারীদের সাথে সংযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা মৈত্রেয়ী, দেবী, এবং প্রবীরকে ধন্যবাদ জানাই। ভূমিকাদুটি লিখে দেওয়ার জন্য আমরা সোমা রায় এবং সায়ন ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রাথমিক আলোচনা এবং ইউসিএলএ-তে জমা দেওয়া প্রস্তাবে সহযোগিতার জন্য আমরা রায়না রায়কে ধন্যবাদ জানাই।

প্রাথমিক পর্যায়ে মতামত দেওয়ার জন্য আমরা পূজা বালসুব্রহ্মনিয়ম এবং তথাগত সেনগুপ্তকে ধন্যবাদ জানাই। মতামতগুলো প্রকল্পের গতিপথ নির্ধারণে প্রভূত সাহায্য করেছে।

এই বইটির বিষয়বস্তু, বিন্যাস এবং সামগ্রিক রূপদানে অমূল্য সাহায্যের জন্য আমরা ঋ কে ধন্যবাদ জানাই। ঋ ছাড়া এই বইটি সম্ভব হত না।

মুদ্রণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদানের জন্য আমরা সুশোভনকে ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের গবেষণার নৈতিক পর্যালোচনা বিনামূল্যে পরিচালনা করার জন্য আমরা সেন্টার ফর সেক্সুয়ালিটি অ্যান্ড হেলথ রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি (C-SHaRP)-কে ধন্যবাদ জানাই। নৈতিক পর্যালোচনা প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য আমরা C-SHaRP-এর এল. রামকৃষ্ণন, বিজয়লক্ষ্মী লোগানন্নাথন এবং ভেঙ্কটেশন চক্রপাণিকে ধন্যবাদ জানাই।

এই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার জন্য আমরা ইউসিএলএ উইলিয়ামস স্কুল অফ ল-কে ধন্যবাদ জানাই। ইউসিএলএ উইলিয়ামস স্কুল অফ ল-এর আরি শ এবং ক্লারিসা মোরান পুরো প্রকল্প জুড়ে আমাদের মূল্যবান লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করেছেন।

এই পুরো প্রকল্পে সিন্টু বাগুইকে সহযোগিতা ও অনুপ্রাণিত করার জন্য আমরা কলকাতা আনন্দম ফর ইকুয়ালিটি অ্যান্ড জাস্টিস-এর পুরো দলকে ধন্যবাদ জানাই।

আমরা উল্লেখ করছি যে প্রতিবেদন এবং এর ফলাফলের সমস্ত দায়ভার শুধুমাত্র লেখকদেরই।

Published By Daxayoni Prokashoni

First published on December, 2025, in Calcutta, India

A digital version of this book is available in the Internet Archive;
at https://archive.org

Daxayoni Prokashoni is a self-guided publishing imprint by Wree. Through Daxayoni, Wree publishes books, little magazines, zines, newsletters, videos, and podcasts. Wree hosts a digital library, a decentralised invite-based community blog, and an internet radio and podcast station.

Access resources, tools, and services
at https://wree.quest

এই বইতে পাবেন তৃণমূল স্তরের রূপান্তরকামী মানুষের জীবনে ক্ষমতায়নের কিছু গল্প। পশ্চিমবঙ্গের রূপান্তরকামী মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থা কীরকম? কোভিড লকডাউনের পরে অনেককেই কাজ বদলাতে হয়েছে। অনেকে এখনো কোন স্থায়ী কাজ পায়নি। অনেকের প্রচুর ধার-দেনা হয়ে গেছে। কী কী সমস্যার মধ্যে দিয়ে এদের যেতে হয়েছে? কতজন এখনো স্ট্রাগল করছে? তৃনমূল স্তরে গবেষণা কীরকম হয়? এরকম কিছু প্রশ্নের তদন্ত নিয়েই সিন্টু আর আয়েশা এই বইটা লিখেছেন

সিন্টু একজন গ্রাসরুট (তৃনমূল স্তরের) অ্যাক্টিভিস্ট, স্বাধীন গবেষক, এবং এই বইয়ের প্রাথমিক লেখিকা। সিন্টু যৌনকর্মীর সন্তান। সিন্টুর দুষ্টু ও চিনি নামে দুটো কুকুর আছে। সিন্টু প্রকৃতির মাঝে সময় কাটাতে ভালোবাসে। সিন্টু দারুণ গল্প বলে। বন্ধুরা সিন্টুর হাতের রান্না খেতে চাইলে সিন্টুর খুব ভালো লাগে। সিন্টু সত্তরের দশকের হিন্দি দুঃখের গান শুনতে ভালোবাসে। সিন্টু কার্টুন দেখতে ভালোবাসে। সিন্টু কুমড়ো খেতে পছন্দ করে না।

আয়েশা একজন শিক্ষাগবেষক। আয়েশা বোম্বে'র হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশনে পড়ায়। আয়েশা বাড়িতে থাকতে পছন্দ করে। আয়েশা লেখিকা-পরিচিতি লিখতে চায় না। আয়েশা এই বইয়ের সহ-লেখিকা।

ঋ একজন স্বতন্ত্র বহুমাত্রিক শিল্পী। ঋ এই বইয়ের সম্পাদিকা এবং প্রকাশিকা। ঋ এর সব বিষয়ে কোন না কোন মতামত আছে। ঋ জাস্ট জানে। বন্ধুরা ঋ এর কাছে প্রায়শই খবর আর পরামর্শ চায়। ঋ পাস্তা স্যালাড খেতে ভালোবাসে। ঋ শাকসবজি পছন্দ করে।ঋ সবসময়ই কিছু না কিছুর তালিকা বানায়। ঋ যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে নেয়।

*

DAXAYONI PROKASHONI
A PUBLISHING IMPRINT BY WREE